মুহম্মদ
জাফর
ইকবাল

ঢাকা নামের শহর ও অন্যান্য

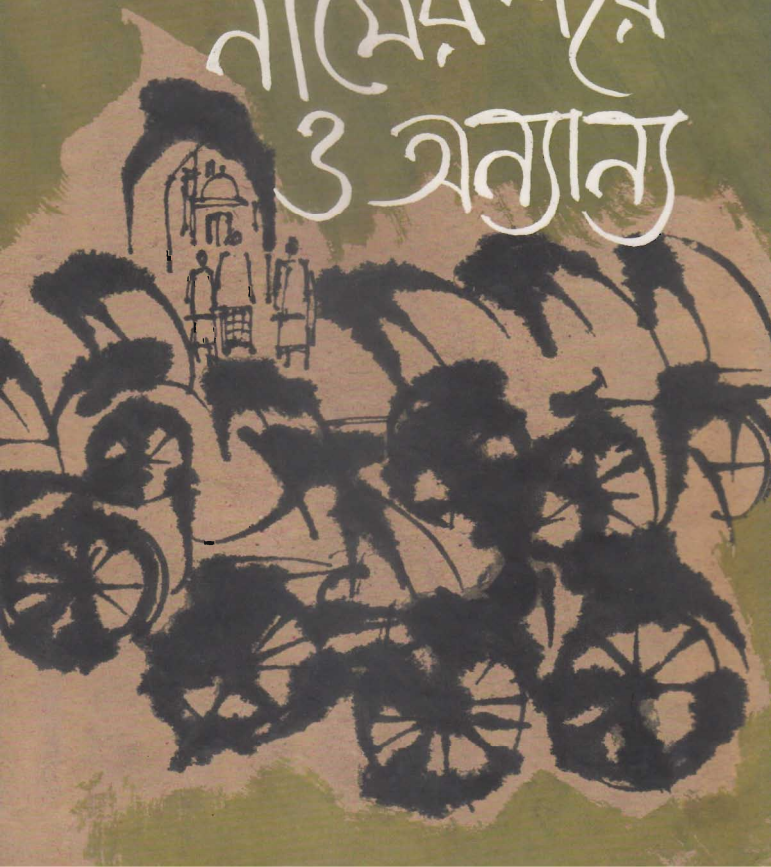

তুমুল জনপ্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল।
অন্যায় আর অনিয়মের বিরুদ্ধে
সোচ্চার তাঁর কলম। সাদাসিধে
ভাষায় মেরুদণ্ড টানটান করে কথা বলেন তিনি।
সম্প্রতি লিখেছেন ডিজিটাল টাইম, শিক্ষানীতি,
ক্রসফায়ার, ঢাকা শহরের যানজট,
পিলখানা ট্র্যাজেডি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে।
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সেসব
লেখা নিয়ে বেরোল এ বই।

ISBN 978 984 8765 36 4
9 789848 765364

ঢাকা নামের শহর ও অন্যান্য মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রথমা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেটে।
বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ
ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং
মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র,
পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের
ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে।
ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি
এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে
বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন।
আঠার বছর পর দেশে ফিরে ১৯৯৪
সালে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ
দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং
কন্যা ইয়েশিম।

প্রচ্ছদ শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

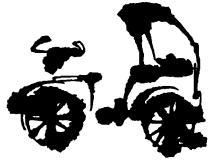

ঢাকা নামের শহর ও অন্যান্য

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ঢাকা নামের শহর ও অন্যান্য

ঢাকা নামের শহর ও অন্যান্য
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১৬, একুশে বইমেলা ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৮, এপ্রিল ২০১১
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : এক শ ষাট টাকা

Dhaka Namer Shohor O Onnannya
by Muhammed Zafar Iqbal
Published in Bangladesh by *Prothoma Prokashan*
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Price : Taka One Hundred Sixty Only

ISBN 978 984 8765 36 4

উৎসর্গ

সোহরাব, হাবীব ও লিজা
(আমার প্রিয় থ্রি মাসকেটিয়ার্স
যাদের নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছি!)

ভূমিকা

প্রতিবছর এ সময়ে আমি আমার সারা বছরের লেখাগুলো একত্র করে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বছরটা কেমন গেছে বোঝার চেষ্টা করি। এ বছরের লেখাগুলোর দিকে চোখ বুলিয়েই বুঝে নেওয়া যায়, এবার আমি সবচেয়ে বেশি সরব ছিলাম যুদ্ধাপরাধীর বিচার নিয়ে। দেশের সব মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এর সমাপ্তি দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছি—অনেক লেখাতেই সে বিষয়টা ঘুরেফিরে চলে এসেছে।

লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি আরও একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি, এ বছরের লেখালেখিতে বৈচিত্র্য একটু বেশি; তার অর্থ, অনেক কিছু ঘটেছে যেগুলো আমাকে অনুরণিত করেছে। পারমাণবিক শক্তি, ডিজিটাল টাইম, শিক্ষানীতি, ক্রসফায়ার কিংবা ঢাকা শহরের যানজট—কোনো কিছুই বাকি নেই। তবে সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে—যে বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছিল—পিলখানা ট্র্যাজেডি, সেটা নিয়ে আমি যে লেখাটা লিখে মনের ক্ষোভটুকু প্রকাশ করেছিলাম, সেটা কিন্তু কোথাও পাঠাইনি। বই হিসেবে প্রকাশ করার সময় সেই লেখাটিও এখানে জুড়ে দিচ্ছি।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
২৯ ডিসেম্বর ২০০৯
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

সূচিপত্র

উনিশ বছর থিওরি এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার	১১
কেমন করে লেখা হলো	১৮
ক্ষমা নেই	২৩
মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মের শেষ সুযোগ	২৭
বাংলাদেশে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র	৩৫
পিলখানা ট্র্যাজেডি	৪৪
ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনা	৫০
তাজউদ্দীন আহমদের হাতঘড়ি	৫৩
ঢাকা নামের শহর	৬১
শিক্ষানীতির সহজ পাঠ	৭১
ডিজিটাল টাইম এবং ঘোড়ার মৃতদেহ	৮২
যুদ্ধাপরাধীর বিচার	৮৮
ক্রসফায়ার	৯১
গ্লানিমুক্তির ডিসেম্বর	৯৬
স্বপ্নের দেশ	১০২
প্রথম বছর	১০৬

উনিশ বছর থিওরি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

আমার পরিচিত এক সহকর্মীর একটা থিওরি আছে, তার সেই থিওরির নাম হচ্ছে 'উনিশ বছর থিওরি'। সেই থিওরি অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি উনিশ বছর পর একটা যুগান্তকারী শুভ ঘটনা ঘটে। ১৯৫২ সালে যেটা ঘটেছিল, আমরা সেটা জানি— আমাদের ভাষা আন্দোলন। তার ১৯ বছর পর, ১৯৭১ সালে, এই দেশে হলো মুক্তিযুদ্ধ, আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম একটা দেশ পেলাম। ১৯৭১ সালের ১৯ বছর পর, ১৯৯০ সালে, আমরা স্বৈরাচারী সামরিক শাসকদের দূর করে গণতন্ত্র পেলাম। 'উনিশ বছর থিওরি'র আবিষ্কারক আমার সহকর্মীর ধারণা, আরও ১৯ বছর পার হয়ে ২০০৯ এসেছে। এ বছর আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে এই দেশকে গ্লানিমুক্ত করব। আমার ধারণা, যারা 'উনিশ বছর থিওরি'র কথা বিশ্বাস করে এবং যারা করে না, তারা কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দেখার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে!

দুই.

নির্বাচনের পর থেকেই আমার মনে ফুরফুরে একটা আনন্দ। এ দেশের মানুষ সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। আমাদের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, তারা এ দেশের মানুষের আত্মত্যাগ, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব কিংবা পুরো দেশের অর্জনটুকু নিজের চোখে দেখেনি। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর তাদের ভুল ইতিহাস শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই প্রায় তিন যুগ আগে ঘটে

যাওয়া সেই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আমাদের নতুন প্রজন্মের একটা নিস্পৃহ মৃদু কৌতূহলের বাইরে কিছু না থাকলেও আমাদের কিছু করার ছিল না। কিন্তু আমাদের বিশাল সৌভাগ্য, সেটা ঘটেনি। আমাদের নতুন প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধের জন্য রয়েছে তীব্র আবেগময় এক ধরনের ভালোবাসা, স্বাধীনতাবিরোধীদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর এক ধরনের ঘৃণা। তাদের সেই অনুভূতির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানার কোনো সহজ উপায় ছিল না। এই নির্বাচন আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে। নতুন প্রজন্মকে তাই আমাদের অভিনন্দন। আমাদের দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল, রাজনৈতিক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নানা ধরনের সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সবশেষে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম এই অসাধারণ ঘটনাটি ঘটিয়ে দেশকে তার সঠিক লক্ষ্যের দিকে তুলে দিয়েছে। তাদের সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যেই জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তাব পাস হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কোনো রকম রাখঢাক না করেই খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এই দেশের মানুষ তাঁদের ভোট দিয়েছেন, কারণ তাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলেছেন। তাঁদের এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতেই হবে, তা না হলে ওয়াদার বরখেলাপ হয়ে যাবে। আমি জানি, প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য দেশের কোটি কোটি মানুষের কানে শুধু মধু নয়, রীতিমতো সুধা বর্ষণ করেছে।

শুধু যে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলেছেন তা নয়, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে যুদ্ধাপরাধীরা যেন দেশ থেকে পালিয়ে যেতে না পারে সে ব্যাপারটাও নিশ্চিত করা হয়েছে। একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা একবার পালিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি করে তারা পৃথিবীর দেশে দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ঘুরে ঘুরে কাঁদুনি গেয়ে বেড়িয়েছে। পঁচাত্তরে পটপরিবর্তনের পর যখন এ দেশে একটা অন্ধকার যুগের সূচনা হয়েছিল, তখন তারা একে একে দেশে ফিরে এসেছিল। স্বাধীনতাবিরোধী এই গোষ্ঠীকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, বিপদ দেখলে তারা আবার দেশ থেকে পালিয়ে যেতে পারে; তাদের পালাতে না দেওয়াটা বিচারের স্বার্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার!

তিন.

এই দেশে একটা অন্ধকার যুগ ছিল, তখন কিছু কিছু কথা বলা যেত না। ১৯৭১ সালে এ দেশে গণহত্যা শুরু করেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী, কিন্তু সেটা বলা

যেত না, বলতে হতো 'হানাদার বাহিনী'। এই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞে এ দেশের যে কুলাঙ্গাররা সাহায্য করেছিল, তাদের নাম ছিল 'রাজাকার বাহিনী'। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের রেডিও-টেলিভিশনে 'রাজাকার' শব্দটি উচ্চারণ করা যেত না। (মানুষের মুখে উচ্চারিত হতে পারবে না, কিন্তু পশুপাখির মুখে উচ্চারিত হতে তো বাধা নেই; সেই জন্য টেলিভিশনের নাটকে টিয়া পাখির মুখে 'তুই রাজাকার' কথাটি উচ্চারণ করিয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদ) পাঠ্যবইয়ে সত্যিকারের ইতিহাস ছিল না, কেউ সত্যিকারের ইতিহাস পড়ালে তাঁর ওপর কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হতো। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় চাকরি চলে যেত। মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সন্তান হওয়ায় চাকরি হতো না; যদি বা চাকরি হতো, পদোন্নতি হতো না। সামরিক বাহিনীর অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ—মার্শাল কোর্টে বিচার করে কিংবা না করেই মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো।

আমরা সেই অতীত পেছনে ফেলে এসেছি। এখন আমরা স্পষ্ট ভাষায় সবাইকে বলি, একাত্তরের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী; আমরা আঙুল দিয়ে রাজাকারদের চিহ্নিত করি; মতিউর রহমান নিজামী কিংবা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ যে বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন, সেটি প্রতিমুহূর্তে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিই। আমাদের অত্যন্ত মুক্ত একটা সংবাদমাধ্যম আছে, সেই মাধ্যমে আমরা সেনাবাহিনীরও সমালোচনা করি, বিচার বিভাগের সীমাবদ্ধতার কথাও বলে ফেলি। কোনো সংবাদপত্রকে যদি কোনো দলের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে ফেলে। সেই সংবাদমাধ্যম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সামনে নিয়ে এসেছে, নিরপেক্ষতার কথা বলে স্বাধীনতাবিরোধীদের স্থান করে দেয়নি।

যত দিন আমাদের দেশে এই অত্যন্ত শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম থাকবে, আমাদের ভয় পাওয়ার বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। গত নির্বাচনে বিরোধী দল বলে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, যেটুকু আছে তাদেরও এখন পর্যন্ত সংসদের ভেতরে সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে না। যদি শেষ পর্যন্ত কার্যকর কোনো বিরোধী দল না থাকে, তাহলে এই সংবাদমাধ্যমকেই আসল বিরোধী দলের ভূমিকা নিতে হবে।

চার.

খবরের কাগজে দেখেছি, জামায়াতে ইসলামী নাকি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাদের ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাইবে। তবে তারা বেশ পরিষ্কারভাবে বলেছে, ক্ষমা চাইবে তাদের 'ভুল' রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য; একাত্তরে যে হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, লুণ্ঠন,

অগ্নিসংযোগ হয়েছিল তারা সেটা 'করেনি', তাই তার জন্য তারা ক্ষমা চাইবে না। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল আজ থেকে ৩৮ বছর আগে। এত দিনে একটিবারও তাদের ভুল স্বীকার করার কথা মনে পড়ল না—শুধু যে মনে পড়ল না তা নয়, জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযম এবং তাদের অন্য নেতারা উল্টো সদম্ভে বলে এসেছেন, 'একাত্তরে আমরা কোনো ভুল করিনি!' তাহলে এত দিন পর হঠাৎ করে কেন তাঁদের মনে হচ্ছে যে আসলে ভুল হয়েছিল? ক্ষমা চাওয়া দরকার?

তাহলে কি তাঁদের একধরনের বোধোদয় হয়েছে? এই বোধোদয় আসলে কোনো গভীর চিন্তা বা শুভবুদ্ধি থেকে আসেনি, এটা এসেছে চামড়া বাঁচানোর চিন্তা থেকে। এই দলটি ক্ষমতায় গিয়েছিল বিএনপির ঘাড়ে চড়ে। এবারের নির্বাচনে ভরাডুবির পর বিএনপি যখন জামায়াতে ইসলামীকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে, তখন হঠাৎ করে তারা টের পেতে শুরু করেছে যে এ দেশে আসলে তাদের স্থান নেই। একটা দলকে টিকিয়ে রাখতে হলে তার মধ্যে নতুন মানুষ আনতে হয়; এ দেশের নতুন প্রজন্মের কী দায় পড়েছে যে রাজাকার-আলবদর- স্বাধীনতাবিরোধীদের দল করার? জামায়াতে ইসলামী ইসলামকে রক্ষা করবে— সেই কথা তো এ দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না। সব রাজনৈতিক দলই—আগে হোক পরে হোক—ক্ষমতায় গেছে, কারও আমলেই তো ধর্ম-কর্ম করতে সমস্যা হয়নি! তাহলে কেন রাজাকার-আলবদরদের সিল দেওয়া ইসলাম করতে হবে? অন্ধকার জগতের সুযোগ নিয়ে জামায়াতে ইসলামী মগজ ধোলাই করে, লোভ দেখিয়ে তার দলে কিছু মানুষকে টেনেছিল। কিন্তু এই আধুনিক বাংলাদেশে যেখানে সব তথ্য সবার কাছে উন্মুক্ত, যখন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের কথা নতুন করে নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করেছে, সেখানে আধুনিক ছেলেমেয়েরা কেন স্বাধীনতাবিরোধী আলবদর-রাজাকারদের দল করতে যাবে? তারা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন মানুষজন এক ধরনের ঘৃণা নিয়ে তাদের দিকে তাকায়। তারা কি সেটা অনুভব করে না? স্বাধীন-মুক্ত বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের জঞ্জাল টেনে কেন তাদের সেই ঘৃণার জগতে বেঁচে থাকতে হবে?

সারা দেশের মানুষ যখন স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে একতাবদ্ধ, তখন জামায়াতে ইসলামী 'ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে'র জন্য ক্ষমা চাওয়ার কথা ভাবছে। যখন সত্যি সত্যি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হবে, একেকজন মানুষের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা শুরু হবে, তখন তারা কী করবে? জামায়াতে ইসলামীর নেতৃস্থানীয় ১৬ জনের ১১ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আছে। যদি সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয় তখন কি তারা আরও একবার ক্ষমা চাইবে? এবার যুদ্ধাপরাধের জন্য? আমি খুব আগ্রহ নিয়ে সেটি দেখার অপেক্ষা করছি।

পাঁচ.

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টা চলে আসার পর আজকাল এটা নিয়ে নানা দিক দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সবাইকে মাফ করে দিয়েছেন, সে জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও বিচার করা যাবে না—এ ধরনের একটা অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। গত কিছুদিনে সেটা মোটামুটিভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। তার পরও যাদের ভেতর বিভ্রান্তি রয়েছে, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে ১৯৭২ সালে দালাল আইনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল করে স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচারকাজ শুরু করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার একটা সাধারণ ক্ষমা দিয়ে তাদের একটা অংশকে শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধাপরাধী; যারা খুন, জখম, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো ভয়ংকর অপরাধ করেছিল, তাদের কাউকেই কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের বিচার চলছিল এবং চিকন আলী রাজাকার নামে একজনকে ফাঁসির আদেশও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের পর সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। যুদ্ধাপরাধের জন্য আটক ১১ হাজার ভয়ংকর অপরাধীকে ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করে বিচারপতি আবু সায়েম ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার ক্ষমা করে দেয়। সেই দায় আমরা এখনো বহন করছি।

যুদ্ধাপরাধীদের কীভাবে বিচার করা হবে, সেটা নিয়ে খবরের কাগজে আলোচনা হচ্ছে, টেলিভিশনে নিয়মিত টক শো হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট ১৯৭৩ যথেষ্ট কি না, জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন কি না, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি রাষ্ট্র (বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, যেগুলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সরাসরি বিরোধিতা করেছিল) আমাদের চাপ দিতে শুরু করবে কি না—এসব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়েছে। এগুলো বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার, তাঁরা এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করতে পারেন। তবে আমি নিজে সাধারণ মানুষ, আমি পুরো ব্যাপারটা খুবই সাধারণভাবে বুঝি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ; ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এর স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন থেকে যারা এ দেশে স্বাধীনতাবিরোধী কাজ করেছিল, মানবতাবিরোধী কাজ করেছিল, তারা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী। তাদের বিচার করার প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করবে এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকার। বাইরের দেশ আমাদের চাপ দেবে কি দেবে না, সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়—এ দেশকে গ্লানিমুক্ত করা হচ্ছে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

জাতিসংঘের সাহায্য নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে সবার একটা বিষয় জানা দরকার—সেটা হচ্ছে, জাতিসংঘের সাহায্যে বিচার অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কম্বোডিয়ায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শেষ হতে দীর্ঘ সাত বছর লেগে গেছে। আমরা কি সাত বছরের জন্য এই বিচারকাজ স্থগিত করে দেব? বাংলাদেশ একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। এ দেশের অপরাধীদের বিচার করার জন্য আমাদের জাতিসংঘের সাহায্য কেন নিতে হবে, সেটাও আমি ভালো করে বুঝতে পারি না। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী আছে, তাদের ধরে এনে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে কি না সেটা নিশ্চয়ই জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করা যায়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু হওয়ার পর আমরা পাশাপাশি আরও দুটি বিষয় দেখতে পাব। তার একটি হচ্ছে, একাত্তরের সেই ভয়ংকর নৃশংসতা-হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার-অবিচারের ইতিহাস সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে নতুন করে বের হতে শুরু করবে এবং সেগুলো ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে পৃথিবীর মানুষের কাছে যুগ-যুগান্তরের জন্য রক্ষিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সেই সময়ে নির্যাতিত মানুষেরা প্রথমবারের মতো তাঁদের বুকের ভেতর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা দুর্বিষহ স্মৃতিগুলো প্রকাশ করে ভারমুক্ত হতে পারবেন। এ বিষয়টির খুব প্রয়োজন ছিল; রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনো করা হয়নি, দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও করা খুব প্রয়োজন।

ছয়.

কয়েক দিন থেকে শহীদজননী জাহানারা ইমামের কথা আমার খুব মনে পড়ছে। তাঁর জীবনের একেবারে শেষ দিনগুলো কেটেছে মিশিগানের একটি হাসপাতালে। আমি তখন যুক্তরাষ্ট্রে। যখন বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি আর বাঁচবেন না, তখন আমরা বেশ কয়েকজন নিউইয়র্ক থেকে সারা রাত গাড়ি চালিয়ে মিশিগান গিয়েছিলাম তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে। হাসপাতালে তাঁকে দেখা নিয়ে কড়াকড়ি ছিল—একসঙ্গে দুজনের বেশি যেতে পারবে না। দুজন দুজন করে সবাই যাচ্ছে। একসময় আমিও গিয়েছি। হাসপাতালের কেবিনে সবকিছু ধবধবে সাদা। ধবধবে সাদা বিছানায় হাঁটুতে মুখ রেখে চুপচাপ বসে আছেন শহীদজননী, তখন আর কথা বলতে পারেন না, আমাদের দেখে একটু হাসলেন। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি কাঁদতে শুরু করেছেন। জাহানারা ইমাম তখন একটা কাগজে লিখলেন, 'এখন কাঁদার সময় নয়, এখন হাসার সময়!' আমার মনে আছে, মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগেও হাসপাতালের সেই বিছানায় বসে কাগজে তিনি লিখেছিলেন বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবেই হবে!

আজ আমরা সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। সত্যি সত্যি আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছি। শহীদজননী জাহানারা ইমাম বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই মুখ টিপে হেসে বলতেন, 'আমি বলেছিলাম না! তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করনি!'

আমরা বলতাম, 'কে বলেছে বিশ্বাস করিনি! এক শ বার বিশ্বাস করেছিলাম। সে জন্যই তো আমরা আমাদের ছাত্রী হলটির নামকরণ করেছিলাম আপনার নামে!'

প্রথম আলো : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

কেমন করে লেখা হলো

বেশ কিছুদিন আগে আমরা এক ধরনের কিছু মানুষ একসঙ্গে বসেছিলাম, কী করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তখন আমি বললাম, 'আমার কী ইচ্ছে করে জানেন?' যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন আমার ইচ্ছেটা কী। আমি বললাম, 'আমার ইচ্ছে, খুব ছোট করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা লেখা, যেন যে কেউ সেটা কোনো রকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে পারে।' ছোট বলতে আমি আসলেই খুব ছোট বুঝিয়েছিলাম, খুব বেশি হলে এক ফর্মা। তবে এই ইতিহাসটার একটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য থাকবে—সেটা হচ্ছে, প্রত্যেকটা লাইনের রেফারেন্স থাকবে। যে কথাটি বলা হবে, সেটি যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্য কথাটি কোন বিশ্বাসযোগ্য জায়গা থেকে তোলা হয়েছে সেটাও লেখা থাকবে। যার ইচ্ছে করবে, সে ওই রেফারেন্সটা ঘেঁটে দেখতে পারবে—তথ্যটা যে সত্যি, সেটা সে নিজেই নিজের কাছে প্রমাণ করে ফেলতে পারবে।

সেদিন সেখানে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই মাথা নেড়ে বললেন, আইডিয়াটা খারাপ না। আমি ইতস্তত করে বললাম, আমার ইচ্ছেটা আরেকটু বড়—আমার ইচ্ছে, লিফলেটের মতো করে লেখা এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছাপা হবে আট কোটি, যেন এ দেশের লেখাপড়া জানা সব মানুষ এটি পড়তে পারে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এত আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জন রয়েছে যে, কেউ যদি সেটা জানে তাহলে দেশের জন্য তার ভালোবাসা আর মমতা না হয়েই পারে না।

আমার ধারণা ছিল, আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র সবাই হি হি করে হেসে উঠবে। কিন্তু কেউ হাসল না, বরং একজন গম্ভীর হয়ে বলল, 'এটা এমন কিছু

অবাস্তব পরিকল্পনা নয়। আমার মনে হয়, আমরা এই প্রজেক্টটা হাতে নিতে পারি।' আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সবাই তাঁর কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই এটার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়। কবে লেখা হবে, কীভাবে লেখা হবে—এসব নিয়ে কথাবার্তা হতে থাকে। আমাদের মধ্যে একজন কমবয়সী মেয়েও ছিল, হঠাৎ করে সে বলল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সবাই জানতে চাইল, কী প্রস্তাব। মেয়েটি বলল, 'আমার মনে হয়, জাফর ইকবাল স্যার যদি এটা লেখেন তাহলে সেটা কমবয়সী ছেলেমেয়েরাও আগ্রহ নিয়ে পড়ে ফেলবে।'

আমি কিছু বলার আগেই সবাই মাথা নেড়ে সেই কমবয়সী মেয়েটির প্রস্তাব মেনে নিল। আর তাই বইটি লেখার দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। আমি মোটেও এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

আমি আমার জীবনে অনেক ধরনের লেখা লিখেছি, কিন্তু কখনোই ইতিহাস লিখিনি। আমি জানি, আমার আসলে ইতিহাস লেখার ক্ষমতা নেই। ইতিহাস লেখার সময় পুরোপুরি নির্মোহ হয়ে যেতে হয়, আবেগকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হয়; আমি সেটা পারি না, অত্যন্ত সাধারণ কিছু লিখতে গেলেও তার মধ্যে আবেগ চলে আসে। মুক্তিযুদ্ধের মতো একটা বিষয় নিয়ে লিখব অথচ তার মধ্যে কোনো আবেগ থাকবে না, সেটা কেমন করে হয়! তখন আমাকে কয়েকজন ভরসা দিলেন; বললেন, লেখার মধ্যে একটু-আধটু আবেগ চলে এলে কোনো ক্ষতি নেই, সত্যি কথা বলার সময় আবেগ আসতেই পারে।

আমি তখন একদিন আমার নোট বইয়ে একটা তালিকা তৈরি করতে বসলাম—মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখতে হলে তার মধ্যে কী কী বিষয় আসতে পারে। প্রথম দফায় সেখানে এল ৩৭টি বিষয়। আমি সেই তালিকা যাকেই দেখাই, সে-ই ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি এক ফর্মার বইয়ে এত কিছু লিখবে?' আমি উত্তর না দিয়ে মাথা চুলকাই, কারণ মুক্তিযুদ্ধ তো বিশাল একটা ব্যাপার। এটা তো হঠাৎ করে হয়নি—কেউ একজন একটা সুইচ টিপে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, এটা তো মোটেও সে রকম ব্যাপার নয়। এর পেছনে অনেক পুরোনো ইতিহাস আছে, অনেক অবিচার-শোষণ আর আন্দোলনের ইতিহাস আছে। সেগুলো কিছু না বলে হুট করে তো আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলা যায় না। শুধু মার্চ মাসেই যা যা ঘটেছে, সেগুলো লিখলেই তো মহাভারত হয়ে যাবে!

যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, তখনো তো সেটা কত বহুমুখী ইতিহাস! প্রথম দিকের বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ, বাংলাদেশ সরকার হওয়ার পর পরিকল্পনা করে যুদ্ধ।

এক দিকে নিয়মিত বাহিনী, অন্য দিকে গেরিলা বাহিনী। এক দিকে দেশের ভেতরে আটকে থাকা মানুষের কষ্ট, অন্য দিকে শরণার্থীদের কষ্ট! এক দিকে রাজাকার-আলবদরের নৃশংসতা, অন্য দিকে আমেরিকা-চীন-মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র! যুদ্ধের শেষে বিজয়ের পর কি হঠাৎ করে থেমে যেতে পারি? পঁচাত্তরে যে অন্ধকার যুগের সূচনা হলো, সেটা না বলে কি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শেষ করা যায়? আর শেষ করব কখন? এক ফর্মার মধ্যে আমি কেমন করে এত কিছু লিখব?

আমি নিজেকে কখনোই সাহিত্যিক হিসেবে ভাবি না। বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার-কল্পকাহিনি লিখে তাদের মধ্যে একটা পরিচিতি হয়েছে, তারা প্রতিবছরই আমার কাছে নতুন একটি-দুটি লেখা আশা করে। আমার যখন কাগজ-কলম নিয়ে তাদের জন্য অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি লেখার কথা, তখন আমি সেটা থামিয়ে রেখে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে বসলাম।

লিখতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম, কাজটা অসম্ভব কঠিন। আমি যা জানি সেটা যদি লিখে ফেলতাম, তাহলে কাজটি এত কঠিন হতো না। কিন্তু কথা দিয়েছি প্রতিটা লাইনের রেফারেন্স দেব। কত শত বই পড়া হয়েছে, মাথার মধ্যে তার হালকা স্মৃতিটা রয়েছে, কিন্তু সেটা এখন কোথায় খুঁজে পাব! আমি থাকি সিলেটে—লিখছিলাম ছুটির মধ্যে ঢাকায়—বইপত্র বেশির ভাগ রয়ে গেছে সিলেটে! কপাল ভালো, ঠিক তখন ঢাকা বইমেলা চলছিল, সেখান থেকে অনেকগুলো বই জোগাড় করে ফেলা গেল। একটা লাইন লিখতে গিয়ে আমার ১০টা বই ঘাঁটতে হয়। যে রেফারেন্স দেব সেটা তো বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে, শুধু ছাপার বই হলেই তো হবে না।

আমি তাই একটা কাজ করতে শুরু করলাম—রেফারেন্সগুলো দেওয়ার চেষ্টা করলাম পাকিস্তানের সামরিক অফিসার বা পাকিস্তানের ঐতিহাসিকদের লেখা বই থেকে। মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিষয়ে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক যদি কিছু বলেন, সেটা তো পুরোনো বা নতুন রাজাকারের কেউই অস্বীকার করতে পারবে না! ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, সেটা নিয়ে কত রকম বিতর্ক! পাকিস্তানি লেখক সিদ্দিক মালিকের বই মনে হয় এই বিতর্ককে একেবারে চিরদিনের জন্য সমাপ্ত করে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কত কাহিনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে! এই ছোট ইতিহাসে আমি তুলে দিয়েছি আরও ছোট একটা ঘটনা—সেটাও পাকিস্তানি লেখকের স্মৃতিচারণা থেকে।

বইটি লিখতে গিয়ে আমাকে অসংখ্য তথ্য খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছে। দীর্ঘ সময় আমি কম্পিউটারের সামনে বসে ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তখন আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি, আমাদের নতুন প্রজন্ম গভীর মমতায় মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য তথ্য, আলোকচিত্র ও ভিডিও পাকাপাকিভাবে পৃথিবীর তথ্যভান্ডারে সঞ্চয়

করে রেখেছে! জগন্নাথ হলের গণহত্যার সেই ঐতিহাসিক ভিডিওটিও আমি খুঁজে পেয়েছি নতুন প্রজন্মের তৈরি করা ওয়েবসাইটের লিংকে।

শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ড্রাফট শেষ হওয়ার পর আমরা আবিষ্কার করলাম, সেটাকে কোনোভাবেই এক ফর্মার মধ্যে আঁটানো সম্ভব নয়। বইটিতে মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঐতিহাসিক ছবি সংযোজনের ইচ্ছে ছিল, বইয়ের আকার দেখে সেই পরিকল্পনা মুলতবি করা হলো। আমার ইচ্ছে ছিল নিউজপ্রিন্টে এক ফর্মা ছাপিয়ে ফেলা, কিন্তু যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁরা রাজি হলেন না—ধবধবে সাদা কাগজ আর চাররঙা লেমিনেটেড প্রচ্ছদ ছাড়া তাঁরা ছাপবেন না। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা প্রচ্ছদে ব্যবহার করতে চান শিল্পী শাহাবুদ্দীনের পেইন্টিং। প্যারিসে তাঁর কাছে টেলিফোন করা হলো—তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে তাঁর পেইন্টিংয়ের কপির ব্যবস্থা করে দিলেন। শিল্পীরা সেটা ব্যবহার করে কভার করলেন, অন্যরা প্রুফ দেখলেন। আমি পাণ্ডুলিপি অনেকের কাছে পাঠালাম—কেউ সাহিত্যিক, কেউ ঐতিহাসিক, কেউ মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের আলোচনা শুনে অনেক কিছু পরিবর্তন করা হলো, পরিমার্জন করা হলো!

যখন এটাকে তার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছে, আমি তখন বান্দরবানে বেড়াতে গিয়েছি। বইটা কম্পোজ করে আমাকে ই-মেইল করে পাঠানো হলো। যেখানে উঠেছি, সেখানে মোবাইল ফোন দুর্বল—ইন্টারনেট পাওয়া যায় না। গাড়ি করে খুঁজে খুঁজে মোবাইল ফোনের টাওয়ার বের করে তার নিচে ল্যাপটপ নিয়ে বসে পাণ্ডুলিপি ডাউনলোড করে পুরোটা দেখে আবার ফেরত পাঠাচ্ছি! আমাদের কপাল ভালো, মাত্র কিছুদিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে!

আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল বিজয় দিবসের আগে বের করা। সেটা সম্ভব হলো না। এটা বের হলো ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে। শহীদ মিনারে সেক্টর কমান্ডার এ কে এম সফিউল্লাহ এটার মোড়ক উন্মোচন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাণিজ্যিক কোনো বই নয়। এটা যে লিখেছে, যে ছেপেছে, যে প্রকাশ করেছে বা যে এটি বিতরণ করছে, তারা কেউ এখান থেকে একটা পয়সাও উপার্জন করার চেষ্টা করেনি—সবাই এটার পেছনে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছে। এই বইয়ের কোথাও কোনো মূল্য লেখা নেই। ছাপতে মোটামুটি ১০ টাকার মতো খরচ হয়েছে বইপ্রতি, কাজেই কেউ যদি এক কপি সংগ্রহ করে ১০ টাকা ধরিয়ে দেয় তাহলে সেটা দিয়ে আরেক কপি ছাপানো সম্ভব হয়। কায়দাটা খারাপ নয়, কারণ এভাবে প্রায় দুই লাখ বই ছেপে বিতরণ করা হয়ে গেছে। আমার পরিকল্পনা ছিল আট কোটি বই ছাপানো, সেটা কত দিনে করা হবে ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না বলে আপাতত এক কোটির কথা মাথায় রেখে এগোনো শুরু করা হয়েছে।

বইটি ছাপানোর পর আমরা যে রকম প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ইতিহাস কখনোই ২২ পৃষ্ঠায় লেখা সম্ভব নয়। ২২ পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকার নাম *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* দেওয়া একধরনের ধৃষ্টতা, কিন্তু পাঠক আমাদের এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করেছেন। তাঁরা সবাই এর পেছনের উদ্দেশ্যটি বুঝতে পেরেছেন। পূর্ণাঙ্গ একটা বই পড়তে সময় নেয়, তার জন্য একধরনের মানসিক প্রস্তুতির দরকার হয়। কিন্তু এই বই পড়তে কোনো মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই—যে কেউ আধা ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ফেলতে পারবেন। পড়ার পর যদি একটু অতৃপ্তি থেকে যায়, তাহলে আরও ভালো; বইয়ের পেছনে ৫৬টা রেফারেন্স দেওয়া আছে—একটা একটা করে পড়া শুরু করে দেওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে অনুরোধ এসেছে এর ইংরেজি অনুবাদের জন্য। সেটাও করা হয়ে গেছে, প্রকাশিত হয়েছে। ও-লেভেল, এ-লেভেলে অসাধারণ ফলাফল করা ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠানে *ডেইলি স্টার* পত্রিকার পক্ষ থেকে সবাইকে এক কপি করে *History of Liberation War* দেওয়া হয়েছে—ঠিক আমরা যে রকম চেয়েছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বইয়ে লেখক হিসেবে আমার নাম লেখা আছে; কিন্তু আমি সবিনয়ে বলতে চাই, এটা মোটেও আমি একা লিখিনি। দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসে, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রবল বিশ্বাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অবিশ্বাস্য মমতা রয়েছে—এ রকম বেশ কিছু মানুষ মিলে আমরা লিখেছি, তাদের সবার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা।

আমরা কি এ মুহূর্তে হাত গুটিয়ে বসে আছি? মোটেও তা নয়। শুধু কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী কিংবা পূর্ণবয়স্ক মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়বেন, ছোট বাচ্চারা পড়বে না, সেটা তো হতে পারে না। ছোট বাচ্চারা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়তে পারবে, সেভাবে কি আমদের লেখা উচিত নয়? চাররঙা ঝলমলে ছবি দিয়ে সে রকম একটা বই কি বের করা উচিত নয়?

আবার আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে! আবার সেটাও লিখে ফেলা হয়েছে—এখন শুধু ছাপানো বাকি। কোথা থেকে সেটা ছাপানোর খরচ জোগাড় হবে, সেটা এখনো কেউ জানে না, সেটা নিয়ে কেউ খুব দুশ্চিন্তায় বলেও মনে হচ্ছে না।

দেশের জন্য মমতা আর আন্তরিকতা নিয়ে শুরু করলে কীভাবে কীভাবে জানি সবকিছু কোনো না কোনোভাবে হয়ে যায়!

এবারও হবে।

প্রথম আলো (ছুটির দিনে) : ২১ মার্চ ২০০৯

ক্ষমা নেই

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' নামে একটি জায়গা আমরা আলাদা করেছি। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর বইপত্র, দলিল, আলোকচিত্র, পোস্টার, ভিডিও—সবকিছু সংরক্ষণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কৌতূহলী ছাত্রছাত্রী সেখানে ঢুঁ মেরে যেতে পারবে। কেউ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো গবেষণা করতে চাইলে তিনি যেন হাতের কাছে সবকিছু পেয়ে যান, সে রকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হবে। এটা নিয়ে আমাদের উৎসাহের শেষ নেই—বইপত্র, পোস্টার, ভিডিও খুঁজে আনা হচ্ছে, ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে, বইয়ের তালিকা করা হচ্ছে। বইগুলো হাতে নিয়ে কৌতূহলী হয়ে খুলে দেখার সময় হঠাৎ করে সিদ্দিক সালিকের *উইটনেস টু সারেন্ডার* বইটি হাতে উঠে এল। একাত্তর সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাবলিক রিলেশনস অফিসার হিসেবে তিনি বাংলাদেশে ছিলেন; গণহত্যা থেকে যুদ্ধ ও পরাজয়—সবকিছু খুব কাছে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। বইটি পুরোপুরি পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। তার পরও সেখান থেকে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। বইটি খুলতেই ২৫ মার্চের রাতের সেই বিভীষিকার বর্ণনাটি চোখে পড়ল। ইংরেজিতে লেখা বই; বাংলায় অনুবাদ করলে সিদ্দিক সালিকের স্মৃতিচারণাটুকু হয় এ রকম: 'আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে টানা চার ঘণ্টা সেই বীভৎস দৃশ্য দেখলাম। এই ভয়ংকর রাতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃশ্য ছিল আকাশছোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখা। ধোঁয়ার কুণ্ডলী মাঝে মাঝে ওপরে উঠে আসে, কিন্তু পরের মুহূর্তে আগুনের শিখা সেটা ছাপিয়ে ওপরে উঠে প্রায় আকাশের নক্ষত্রকে স্পর্শ করতে চায়। সে রাতের চাঁদের জোছনা আর নক্ষত্রের আলোর আভা মানুষের তৈরি গনগনে

চুলার আগুনের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে বড় আগুনের শিখাটি এসেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে...।'

তিন যুগেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে, তার পরও মনে হয় মাত্র সেদিনের ঘটনা। একাত্তরের ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর রাগ বুঝি সবচেয়ে বেশি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর। সেখানে আক্রমণ করার পর বাধা পেয়ে একজন ক্যাপ্টেন ওয়ারলেসে যোগাযোগ করেছে, উচ্চপদস্থ একজন মিলিটারি খেপে গিয়ে সেই ক্যাপ্টেনকে কী বলেছে, সিদ্দিক সালিক সেটাও লিখেছেন। লেখাটি এ রকম: 'পুরো এলাকাটা ধ্বংস করতে কতক্ষণ লাগবে?...চার ঘণ্টা?...ননসেন্স! তোমার কাছে কী অস্ত্র আছে? রকেট লঞ্চার? রিকয়েললেস রাইফেল? মর্টার? আর...ঠিক আছে! এগুলো ব্যবহার করে দুই ঘণ্টার মধ্যে এলাকাটা দখল করো।'

সেই ক্যাপ্টেন দুই ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করেছিল। সিদ্দিক সালিক পরদিন ভোরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়ে তিনটি গণকবর দেখতে পেয়েছিলেন বলে লিখেছেন; বড়টি প্রায় ৫০ ফুট দীর্ঘ। ৫০ ফুট দীর্ঘ একেকটি গণকবরে কতজন ছাত্রকে পুঁতে রাখা যায়, সেটি তিনি লেখেননি। পাকিস্তানি লেখকেরা এ ব্যাপারে অসম্ভব সংযমী!

২৫ মার্চের গণহত্যার হৃদয়হীন অংশটুকু সিদ্দিক সালিক নিপুণভাবে লিখেছেন। রাতের বেলা গণহত্যা করে পরদিন দুপুরে সব মিলিটারি অফিসারের মনে ফুরফুরে আনন্দ। খানাপিনা হচ্ছে। তখন ক্যাপ্টেন চৌধুরী নামের একজন কমলা ছিলে খেতে খেতে বলল, 'বাঙালিদের আচ্ছামতো একটা শিক্ষা দেওয়া গেছে। এখন কম করে হলেও একটা প্রজন্ম সিধে হয়ে থাকব।' কথার উত্তরে মেজর মালিক নামে একজন বলল, 'ঠিকই বলেছ! বাঙালিরা তো এই একটা ভাষাই বোঝে—শক্ত পিটুনি। ইতিহাস তো তা-ই বলে!'

দেখাই যাচ্ছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইতিহাসজ্ঞান খুব ভালো নয়। নয় মাসের মধ্যে তাদের নতুন ইতিহাস শিখতে হয়েছিল। আমার ধারণা, সেই ইতিহাসের কথা তারা এই জন্মে আর ভুলবে না!

সিদ্দিক সালিকের বইয়ের কথাটি হঠাৎ করে তুলে আনার একটা কারণ আছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে তাদের সহযোগী কারা ছিল, সেটা সবচেয়ে ভালো করে কে বলতে পারবে? বলার অপেক্ষা রাখে না, সেটাও নিশ্চয়ই হবেন সিদ্দিক সালিক কিংবা তাঁর মতো কোনো মিলিটারি অফিসার! কাজেই সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্দিক সালিক কী বলেছেন, সেটা নিয়ে আমাদের কৌতূহল থাকতেই পারে। বাংলায় অনুবাদ করলে সেটা দাঁড়ায় এ রকম: 'পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারির সম্পূরক শক্তি হিসেবে রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। একই সঙ্গে সেটা স্থানীয় মানুষদের অংশগ্রহণের একটা

ভাব এনে দিত। টার্গেট ছিল এক লাখ—শেষ পর্যন্ত ৫০ হাজারের মতো দাঁড় করানো গিয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটা রাজনৈতিক ডেলিগেশন এসে জেনারেল নিয়াজির কাছে অভিযোগ করে বলল, (রাজাকার বাহিনী নয়) এ দেশে আসলে জামায়াতে ইসলামীদেরই একটা বাহিনী দাঁড় করানো হয়েছে! জেনারেল নিয়াজি তখন সিদ্দিক সালিককে ডেকে বলেছিল, 'এখন থেকে রাজাকারদের আলবদর আর আলশামস বলে ডেকো, যেন কেউ বুঝতে না পারে যে তারা আসলে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল (জামায়াতে ইসলামী) থেকে এসেছে!' সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, জেনারেল নিয়াজির নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি ঠিক সেভাবেই কাজ করেছেন!

সবার নিশ্চয়ই মনে আছে, যখন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কথাটা খুব জোরেশোরে আসতে শুরু করেছে, তখন জামায়াতে ইসলামী বলতে শুরু করল, একাত্তরে তারা হয়তো বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু সেটা ছিল পুরোপুরি 'রাজনৈতিক' বিরোধিতা! তারা মোটেও অস্ত্র হাতে বিরোধিতা করেনি। একাত্তর সালে তারা যে পাকিস্তানি প্রভুদের আজ্ঞাবহ হয়ে এ দেশে নৃশংস হত্যাযজ্ঞে সহযোগিতা করেছিল, সেই পাকিস্তানি প্রভুরা কিন্তু সে কথা বলে না! তারা বলে, রাজাকার বাহিনী, আলবদর বা আলশামস বাহিনী আসলে ছিল পুরোপুরি জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র বাহিনী।

বঙ্গবন্ধুর নামে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি এ রকম: তিনি সব যুদ্ধাপরাধীকে মাফ করে দিয়েছেন, সে জন্য যুদ্ধাপরাধীদের কোনো দিন বিচার করা যাবে না। এটি একটি মিথ্যা অপপ্রচার। খুন-জখম-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ—এ ধরনের বড় বড় অপরাধ করেনি, এ রকম ২৬ হাজার মানুষকে শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমা করা হয়েছিল। (সেই সময়ে কেন তাদের ক্ষমা করা হয়েছিল, এর পেছনে সম্ভবত নানারকম কারণ ছিল। কিন্তু এখন আমাদের মনে হয়, তাদেরও ক্ষমা করা উচিত হয়নি।) ১১ হাজার ঘাগু যুদ্ধাপরাধীকে মোটেও ক্ষমা করা হয়নি। তারা বিচারের অপেক্ষায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলখানায় অপেক্ষা করছিল। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে দেশের শাসনভার নিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইনটি বাতিল করে রাতারাতি ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে মুক্ত করে দিলেন। এরা নতুন উদ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেসব যুদ্ধাপরাধী দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারাও বুক ফুলিয়ে দেশে ফিরে আসতে শুরু করল। আমাদের দেশের জন্য সেটা ছিল অন্ধকার জগতের শুরু।

আমাদের জন্য এটি এক বিশাল সৌভাগ্য যে, আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পেরেছি। জাতীয় সংসদে সেটা নিয়ে একটা প্রস্তাব পর্যন্ত পাস করা হয়েছে—যুদ্ধাপরাধীরা যেন আবার একাত্তরের

মতো দেশ থেকে পালিয়ে না যেতে পারে, সে জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মাঝেমধ্যে গায়ে চিমটি কেটে দেখি—এটি সত্যিই ঘটছে, নাকি স্বপ্ন দেখছি!

যুদ্ধাপরাধীদের কোন আইনে বিচার করবেন, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করছেন। আমরা বিশেষজ্ঞ নই, সোজা ব্যাপার সোজা করে বুঝি। রাষ্ট্র যদি চায়, খুন-জখম-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধের বিচার ১০০ বছর পরও করতে পারে। পঁচাত্তর সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইনটি বাতিল করা হলেও 'দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্ট ১৯৭৩' বাতিল করা হয়নি। (যুদ্ধাপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক সরকারের চোখ কেমন করে এটি এড়িয়ে গেল, কে জানে!) এই আইনে বিচার করতে হলে অপরাধীদের কোন সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে—সিদ্দিক সালিক তাঁর বইয়ে পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন। রাজাকার, আলবদর ও আলশামস পুরোটাই ছিল জামায়াতে ইসলামীর বাহিনী! দেশের বড় বড় কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘ আর বদর বাহিনীর সদস্য। আমার স্বল্প বুদ্ধি বলে, কোনো নতুন আইন না করে এ আইনেই ঝটপট যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে ফেলা সম্ভব। এতে সুবিধা হচ্ছে, এটি ব্যবহার করে এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল তৈরি করা যাবে। মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে খবরের কাগজের প্রতিবেদন, ছবি, দলিল, গণকবর—এগুলোই ব্যবহার করা যাবে। তদন্তের ব্যাপারটিও প্রচলিত আইন থেকে অনেক সহজ।

সরকার এখন পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতিটুকু রক্ষা করে এর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাত্তর সালে যেসব দেশ স্বাধীনতাসংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল, সেসব দেশ নিশ্চয়ই আবার এর বিরোধিতা করবে। কিন্তু বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশের ভ্রূকুটি তোয়াক্কা না করে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল—প্রায় তিন যুগ পর আবার নিশ্চয়ই সত্যিকার স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মতো মাথা উঁচু করে এই বিচারকাজ শেষ করে আমাদের কলঙ্কের কালিটুকু মুছে ফেলবে।

এ বিচারপ্রক্রিয়ায় আমার যেটুকু আগ্রহ, তার চেয়ে আমার অনেক বেশি আগ্রহ এর ভেতর থেকে যে সত্য বের হয়ে আসবে, সেই সত্যটুকুতে। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা সেই সত্যটুকু খোদাই করে লিখে দেব। অনন্তকাল পরও পৃথিবীর মানুষ জানবে, যে কুলাঙ্গারেরা মাতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বাংলাদেশের মানুষ তাদের ক্ষমা করেনি।

প্রথম আলো : ২৬ মার্চ ২০০৯

মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মের শেষ সুযোগ

কয়েক দিন আগে খবরের কাগজে একটা ছবি বের হয়েছিল। খোলাবাজারে সরকারি উদ্যোগে চাল বিক্রি হচ্ছে; চালের কেজি ১৮ টাকা। যে মানুষটির চাল বিক্রি করার কথা, সে উদাস মুখে বসে আছে। তার দোকানে কোনো ক্রেতা নেই! বাজারে চালের দাম এতই কমে গেছে যে ১৮ টাকা কেজিতে সরকারি চাল কিনতে কারও আগ্রহ নেই! কয়েক দিন পর দেখলাম, চালের দাম কেজিপ্রতি আরও দুই টাকা কমানো হয়েছে। আমি যেখানে বসে লেখালেখি করি, সেখানে প্রতিদিন হরেক রকম পাখি আসত। আমি প্রতিদিন তাদের জন্য একমুঠো চাল দিতাম। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন চালের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গেল (জরুরি অবস্থা বলে কথা বলা বারণ ছিল, তার পরও অনেকেই বলছিল দেশে একটা নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে), আমি তখন পাখিকে চাল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যে দেশে মানুষ খাওয়ার জন্য চাল পায় না, সেখানে আমি কেমন করে পাখিকে চাল খেতে দিই। আমি দেখতাম, প্রতিদিন পাখিগুলো আসত, ইতিউতি করে চাল খুঁজত, আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাত; তারপর হতাশ হয়ে উড়ে চলে যেত। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমি আবার সেই অবোধ পাখিগুলোর জন্য একমুঠো চাল দিয়ে তাদের কিচিরমিচির ডাক শুনতে পারব! আমার তার চেয়েও বেশি আনন্দ হচ্ছে একটা তথ্যে—সরকার ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন করে ফেলতে পারে!

চালের দাম কমে যাওয়ায় জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা কৃষকদের জন্য অনেক দুশ্চিন্তা করছিলেন। যাঁরা চালের দাম কমাতে পারেন, তাঁরা নিশ্চয়ই চালের দাম বেঁধে দিয়ে কৃষকদের রক্ষাও করতে পারেন। আমি তাই দুশ্চিন্তাটা তাঁদেরই করতে দিতে

চাই। যাঁরা খবরের কাগজ পড়ে ধান-চালের খবর নেন, তাঁরা অবশ্য একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন। আমাকে প্রায়ই সিলেট থেকে ঢাকা আসতে হয়। যখন আসি, তখন দেখতে পাই, রাস্তার দুই পাশে যত দূর চোখ যায় সোনালি ধানের শিষ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। সে যে কী অপূর্ব এক দৃশ্য, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না!

চালের দাম কমার ভালো খবরের পাশাপাশি ভয়ানক খবরও আছে। বিডিআরের অস্ত্রভান্ডার থেকে ২০৯টি গ্রেনেড খোয়া গেছে। শুধু গ্রেনেড নয়, ১১৯টি অস্ত্র, ৪০ হাজারের বেশি গুলিও পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলো কার হতে পড়েছে, কীভাবে এগুলো ব্যবহৃত হবে—আমরা কেউ জানি না। কল্পনা করতেও আতঙ্ক অনুভব করি। সাম্প্রতিককালের, কিংবা বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের ইতিহাসেরই সবচেয়ে ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ছিল বিডিআর হত্যাযজ্ঞ। সেই অমানুষিক ঘটনা আমাদের এমনভাবে বিচলিত করেছিল, আমরা আবার কবে সুস্থ মানুষের মতো চিন্তা করতে পারব তা নিজেরাই জানি না। আমি মাঝেমধ্যে পত্রপত্রিকায় লিখি, কোনো কিছু নিজেকে বিচলিত করলে সেটা লিখে দশজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করলে একধরনের স্বস্তি পাওয়া যায়। বিডিআরের সেই ঘটনার পরও আমি একটা লেখা লিখেছিলাম, কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত কোথাও পাঠাইনি। পুরো ব্যাপারটি এত অবিশ্বাস্য, মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা যে আমার মনে হয়েছে, এটাকে ধারণ করে পরিপূর্ণ কিছু লেখার ক্ষমতা আমার নেই। এই ভয়াবহ নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের পেছনের অংশটি কী, আগে ও পরে কী ঘটেছে, মানবিক বিপর্যয় কতটুকু—সেটুকু না জেনে আমি যেটাই লিখি, সেটা হবে অসম্পূর্ণ। আমি নিজে যেটা বুঝি না, সেটা অন্যদের আমি কেমন করে বোঝাব?

বিডিআরের ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। যখন তদন্ত প্রতিবেদন বের হবে, তখন হয়তো অনেক কিছু নিয়ে আমাদের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। তবে যে বিষয়টি নিয়ে কারও কোনো বিভ্রান্তি নেই, সেটা হচ্ছে সেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের সময়টুকুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটা অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কসুলভ ভূমিকা। সেনাকুঞ্জে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডার সেই সিডি কারা কীভাবে বের করেছে, সেটা একটা রহস্য। যারা সেটা শুনেছে, তাদের মনে অনেক নতুন প্রশ্নের জন্ম হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন করে আস্থা ফিরে পেয়েছে।

সরকার ক্ষমতায় এসেছে খুব বেশি দিন হয়নি। নতুন কোনো সরকার ক্ষমতায় আসার পর, প্রথম কিছুদিনকে বলা হয় মধুচন্দ্রিমার সময়। আওয়ামী লীগের সরকার তাদের বিশাল বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর তারা কিন্তু মধুমন্দ্রিমার সময়টুকুও পায়নি। (ভাগ্যিস ঘূর্ণিঝড় বিজলী সিডর হয়ে ওঠেনি, যদি হয়ে উঠত, তাহলে সেটা হতো আরেকটা বিপর্যয়।) তার পরও তাদের যে দুটি কাজ নতুন

প্রজন্মকে আলাদাভাবে উৎসাহিত করেছে, সেগুলো হলো, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। অন্য সব ব্যাপারের মধ্যে এ দুটি কেন আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও সবাই জানে। যুদ্ধাপরাধীদের অস্তিত্ব হচ্ছে আমাদের শরীরে লেগে থাকা ক্লেদের মতো। তাদের বিচার করে ইতিহাসে একটা নতুন পাতা জুড়ে দিয়ে আমরা প্রথমবার ক্লেদমুক্ত হয়ে পূতপবিত্র হব। মাঝেমধ্যেই পরিচিত মানুষজন আমার কাছে দুশ্চিন্তিত মুখে জানতে চান, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সত্যিই হবে তো?'

সরকারের উচ্চপর্যায়ের কারও সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, আমি কোনো ভেতরের খবর জানি না, তার পরও আমি অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলি, 'নিশ্চয়ই হবে!' তার কারণ, আমি জানি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করলে এই সরকার আর কোনো দিন এ দেশের মানুষের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। নতুন প্রজন্মকে ক্লেদমুক্ত জীবন উপহার দেওয়ার একটা ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছে এ সরকার, সেই সুযোগটি তারা কেন গ্রহণ করবে না?

নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার আরেকটা সুযোগ এসেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দিয়ে। আমার আনন্দ অন্য কারণে, কারণ ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলে বুঝে হোক না বুঝে হোক, এই সরকার আসলে অনেকগুলো বড় অঙ্গীকার করে বসে আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আসলে কী বোঝানো হয়, সেটা নিয়ে আলাদাভাবে বলা যায়, কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমেই দরকার একটা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ। এর অর্থ, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়টা ঠিক করতে না পারলে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কথাটা আসলে শুধু স্লোগানই হয়ে থাকবে। কাজেই ডিজিটাল বাংলাদেশের অঙ্গীকার আসলে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে একটা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা করার অঙ্গীকার। আমার ব্যক্তিগত আনন্দ আর উচ্ছ্বাস আসলে এখানেই বেশি। শুধু তা-ই নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য যখন অবকাঠামো দাঁড় করানো শুরু হবে, তখন সবার আগে যে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে, সেটা হচ্ছে বিদ্যুতের সরবরাহ। বিদ্যুৎ ছাড়া আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশের 'ডি'টুকুও করা যাবে না। কাজেই একই সঙ্গে এটা দেশের বিদ্যুৎ-সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার। বিদ্যুৎ হচ্ছে একটা শক্তি। শক্তি তো আর এমনি এমনি আসে না, সেটা পাওয়ার জন্য দরকার জ্বালানি। কাজেই জ্বালানি হিসেবে কয়লা নাকি গ্যাস ব্যবহার করা হবে, সেই বিষয়গুলোও নিশ্চিত করতে হবে। কাজেই সরকারকে জ্বালানিনীতিটাও ঠিক করে নিতে হবে।

(আমি একধরনের আতঙ্ক নিয়ে পারমাণবিক জ্বালানির ব্যাপারে কথাবার্তা শুনছি—আশা করছি, দেশের বিজ্ঞজনেরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। সবাইকে জানতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে থ্রি মাইল আইল্যান্ডে আর

সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দেশে চেরনোবিলে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে—যদি আমাদের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এ রকম কিছু ঘটে, তাহলে কী হবে সেটা চিন্তাও করা সম্ভব নয়!)

যা-ই হোক, যেহেতু এই মুহূর্তে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে কথা হচ্ছে, সেটাই শেষ করা যাক। ডিজিটাল বাংলাদেশ যে শুধু লেখাপড়া, বিদ্যুৎ আর জ্বালানি—এই তিনটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিশ্চিত করবে তা নয়, এটি এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন একটা ঘটনা ঘটাবে। আমরা যদি কোনোভাবে এ দেশের কোনো ক্ষেত্র খানিকটা হলেও ডিজিটাল (বা কম্পিউটারায়ন) করে ফেলতে পারি, তাহলে আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করব যে সেখান থেকে ভোজবাজির মতো দুর্নীতি উধাও হয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি করতে হয় ঘোলা পানিতে, আবছা-আবছা অন্ধকারে কোনো রকম সাক্ষীপ্রমাণ না রেখে। ডিজিটাল বাংলাদেশে যখন প্রতিটি পদক্ষেপ স্বচ্ছ হয়ে যাবে, তখন সেখানে দুর্নীতি করার জায়গা থাকবে না। সাহস করে কেউ যদি করে ফেলে, তাহলে সেটা খুঁজে বের করতে কি-বোর্ডে একবার টোকা দিতে হয়, মাউসে একবার ক্লিক করতে হয়। (চট্টগ্রাম কাস্টমসে এর একটা বড় উদাহরণ তৈরি হয়েছে—দুর্নীতি করতে না পেরে বড় বড় রাঘববোয়াল এখন হাত কামড়াচ্ছে, কীভাবে সেটা বন্ধ করা যায় সে জন্য ষড়যন্ত্র করছে! দেশের অন্য কোথাও যেন এ রকম কিছু না ঘটে, সে জন্যও তলায় তলায় ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।) কাজেই ডিজিটাল বাংলাদেশ হলে আমরা যে শুধু আধুনিক একটা বাংলাদেশ পাব তা নয়, আমরা দুর্নীতিও বন্ধ করতে পারব, নতুন 'আলু-ফালু-কালু' কিংবা নতুন হাওয়া ভবনের জন্ম নেওয়াও বন্ধ করতে পারব।

এটুকু ছিল ভূমিকা, এবার আসল কথায় আসা যাক।

দুই.

নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে চালের দাম কমিয়েছে। বিডিআর হত্যাযজ্ঞের বিপর্যয় সামলেছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। এ ছাড়া আরও কিছু ভালো উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। দেশের মানুষ যখন নিজেদের ভেতরে কথা বলবে, তখন তাদের কথাবার্তায় এসব বিষয় উঠে আসার কথা। কিন্তু সরকারের উচ্চপর্যায়ের মানুষজন কি জানেন, দেশের সাধারণ মানুষ এখন কী নিয়ে কথা বলে? আতঙ্কিত ছাত্রীরা এখন কেন আমাদের কাছে ছুটে আসে? ছাত্ররা কোন ব্যাপারটাকে ভয় পায়? আমার ধারণা, সরকার ভালোভাবেই জানে। যদি না জানে, তাহলে আমি তাদের জানিয়ে দিতে পারি—দেশের মানুষ এখন যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলে, সেটা হচ্ছে ছাত্রলীগের তাণ্ডব। দেশের সাধারণ মানুষ টেলিভিশন আর সংবাদপত্র থেকে

খবরাখবর পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরা এর বাইরেও অনেক কিছু স্বচক্ষে দেখি। আমার কাছে ছেলেমেয়েরা চিঠি লেখে। আমি তাদের কাছ থেকেও আলাদাভাবে অনেক খবর পাই, যেগুলো সংবাদপত্রের খবর হিসেবে ছাপা হয় না; কিন্তু দেশের সত্যিকার অবস্থাটা সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারা দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হতে শুরু করেছে; সংবাদপত্রে সেটা হয়তো কয়েক লাইনের খবর, কিন্তু হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক, আত্মীয়স্বজনের জন্য সেটা যে কত বড় একটা হতাশার ব্যাপার, সেটা কি সবাই জানে?

মাঝখানে একটা সময় গেছে, যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দুপুরবেলা মারপিট, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের কিছু শিক্ষক এ রকম সময়ে ছুটে গিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দলগুলোকে শান্ত না করলে অনেক আগেই খুনোখুনি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যেত। সেদিন আমার অফিসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি, দেখতে পেলাম, পুলিশ ছুটে গিয়ে একজনকে ধরেছে। কেন ধরেছে সেটা নিয়ে কৌতূহল ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হলো। আমি দেখতে পেলাম, তার শরীরের ভেতর থেকে বিশাল একটা কিরিচ বের হয়েছে। এত বড় কিরিচ তৈরি হয়, জানতাম না। সেটা শরীরের ভেতর লুকিয়ে হাঁটাহাঁটি করা যায়, সেটাও জানতাম না। বিকেলবেলা খবর পেলাম, পুলিশ সব মিলিয়ে তিনজনকে ধরে নিয়ে গেছে এবং তিনজনই ছাত্রলীগের কর্মী। একজন আমার সরাসরি ছাত্র। ক্লাস নেওয়ার সময় আমি প্রায়ই তার খোঁজ নিতাম। সবাই ক্লাস করছে, সে কেন ক্লাস করে না—প্রশ্ন করে কোনো সদুত্তর পেতাম না। সে কবে ছাড়া পাবে, আমি জানি না। যখন ছাড়া পাবে, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমি তার কাছে কিংবা তার মতো অন্যদের কাছে শুধু একটা জিনিসই জানতে চাই, গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এত বিশাল একটা বিজয়, তাদের কাছে সারা দেশের মানুষের এত বড় একটা প্রত্যাশা, কিন্তু তারা কেন আওয়ামী লীগের এত বড় একটা অর্জনকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য এমন বদ্ধপরিকর? যেভাবে চলছে, যদি সেভাবেই চলে, তাহলে কত দ্রুত আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য মানুষের মমতাটুকু পুরোপুরি উবে যাবে, তারা কি সেটা জানে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে, তখন আমরা আজকাল নিজের অজান্তেই বলে ফেলি, নিশ্চয়ই এটা ছাত্রলীগের কাজ। দেখা যায়, আসলেই এটা সত্যি। আওয়ামী লীগের নেতারা কি সেটা জানেন?

আমাদের পত্রপত্রিকা মোটামুটিভাবে স্বাধীন। কাজেই আমার ধারণা, আওয়ামী লীগের নেতারা ভালোভাবেই জানেন। তাঁরা হয়তো সমস্যাটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না, কিংবা 'ছাত্রলীগ' নামের সংগঠনটা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে—কোনটা সত্যি, আমাদের জানা নেই।

তিন.

আজ থেকে প্রায় ৩৮ বছর আগে স্বাধীনতার পর আমরা প্রথমবার দেশটাকে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলাম। যাঁরা দেশ চালানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির কোনো কিছু ছিল না। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল, দুঃসময় ছিল, দুর্ভোগ ছিল এবং নিজেদের মধ্যে বিভাজন ছিল। সেই সুযোগ নিয়ে '৭৫ সালে দেশের শত্রুরা দেশটা দখল করে নিয়েছিল। যারা বাংলাদেশকে অর্জন করে এনেছিল, যারা দেশকে ভালোবাসত, তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দেশটা শাসন করেছে অন্যরা। তারা দেশের ইতিহাস পাল্টেছে, দেশের আদর্শকে তছনছ করেছে, ঠেলে ঠেলে দেশটাকে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতার রাস্তায় তুলে দিয়েছে। ১৯৯০ সালে যখন আবার দেশটা গণতন্ত্রের রাস্তায় ফিরে এল, আমরা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। আমরা অবশ্য খুব দ্রুতই আবিষ্কার করেছি, গণতন্ত্রের পথটা এত সহজ নয়; গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে ভোটের একটা রাজনীতি হয়, আর সেই ভোটের রাজনীতির অন্ধকার সরু গলি দিয়ে দেশদ্রোহী যুদ্ধাপরাধীরাও ক্ষমতার অংশ পেয়ে যায়, দেশটাকে অবলীলায় মধ্যযুগে ঠেলে দেয়। তাই ভোটে একটা দল জিতে এলেই আমরা আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে হয় কারা ক্ষমতায় আসছে।

আওয়ামী লীগের নেতারা জানেন কি না জানি না, গত নির্বাচনের বিজয়টি এ দেশের সব প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধির মানুষ তাঁদের নিজেদের বিজয় হিসেবে ধরে নিয়েছেন। একাত্তরে যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন, দেশের জন্য সংগ্রাম করেছেন, দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁরা এখন প্রবীণ। একাত্তরে যাঁরা ছিলেন টগবগে তরুণ, তাঁরা এখন ধীরস্থির, কর্মক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী। অনেক দিন পর তাঁরা আবার দেশকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতে চাইছেন। তাঁরা জানেন, এটা তাঁদের শেষ সুযোগ। এই সুযোগ তাঁদের হাতছাড়া হলে, আবার যখন সুযোগ আসবে তখন হয়তো তাঁরা আর থাকবেন না। যদিও বা থাকেন, বার্ধক্য আর জরা এসে এমনভাবে তাঁদের গ্রাস করবে যে তাঁরা তখন শুধু দূর থেকে ঝাপসা চোখে দেখবেন। জোট সরকারের আমলটি ছিল একটা বিভীষিকার সময়। শুধু যে দুর্নীতি আর লুটপাট ছিল তা নয়, সেটা ছিল যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে ভেতর থেকে দেশকে খুবলে খুবলে খাওয়ার সময়, দেশটার অঙ্গহানি করার সময়। অনেক দিন পর সুযোগ এসেছে দেশের ক্ষতগুলো নিরাময় করে সুস্থ-সুন্দর একটা দেশ গড়ে তোলার। মুক্তিযোদ্ধাদের সেই প্রজন্ম এবার দাঁতে দাঁত চেপে বলছে, এবার আর ব্যর্থ হওয়া চলবে না। যেভাবেই হোক, তারা শেষবারের মতো দেশকে সাহায্য করতে চায়। তাদের সেই সুযোগ করে দিতে হবে।

ছাত্রলীগ করার নামে কিছু অবিবেচক ছেলেকে সেই সুযোগ নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না।

চার.

কয়েক দিন আগে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে একটা দুঃসহ দাবদাহ বয়ে গেছে। সারা দেশ যেন আগুনে ঝলসে যাচ্ছিল। সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল কংক্রিট আর ইট-পাথরের ঢাকা শহর। সেই দুঃসহ তাপমাত্রার খবরের পাশাপাশি আরেকটা খবর পড়ে সারা দেশের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমিও শিউরে উঠেছিলাম। সাভারের অধরচন্দ্র মডেল হাইস্কুলের দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীকে ওদের পরীক্ষা বাতিল করে আড়াই ঘন্টা গনগনে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হলো। এই অমানুষিক নির্যাতন ওদের কোনো শাস্তি হিসেবে দেওয়া হয়নি, এটা করা হয়েছে ঢাকা-১৯ আসনের আওয়ামী লীগের সাংসদ তৌহিদ জং মুরাদ এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

আমি যদি একজন সাংসদ হতাম, আমাকে যদি কোনো স্কুলের ছেলেমেয়েরা অভ্যর্থনা জানাতে চাইত এবং আমি সেই স্কুলে গিয়ে যদি আবিষ্কার করতাম যে স্কুলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে ওদের পরীক্ষা বাতিল করে আড়াই ঘন্টা ধরে গনগনে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি শিশুদের নির্যাতন করার জন্য প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করে দিতাম। ঢাকা-১৯ আসনের সাংসদ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি, বরং তিনি শিক্ষার্থীদের দেওয়া ফুলের মালা গলায় দিয়ে তাঁকে দেওয়া সংবর্ধনাটি উপভোগ করে এসেছেন। খবরের কাগজে সেই ছবি ছাপা হয়েছে। ছবি দেখে দেশের মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠেছে।

এ রকম খবর মাঝেমধ্যেই পত্রিকায় আসে। আমরা মাঝেমধ্যেই দেখি, স্কুলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে রোদ বা বৃষ্টির মধ্যে পতাকা হাতে পথের দুই ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কোনো একজনকে সংবর্ধনা জানাতে। সেই কোনো একজনের যদি বিন্দুমাত্র কমনসেন্স থাকত, তাহলে তিনি জানতে পারতেন যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট বাচ্চারা ওদের হাতের পতাকা নাড়িয়ে আসলে তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছে। ছোট বাচ্চাদের অভিশাপের চেয়ে কঠিন কোনো অভিশাপ এই পৃথিবীতে নেই। এই ছোট বাচ্চাদের বুক আগলে রক্ষা করার কথা ওদের শিক্ষকদের। আমাদের দুর্ভাগ্য, ওদের শিক্ষকেরা ছোট বাচ্চাদের পাশে এসে দাঁড়ান না। চাটুকারিতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে তাঁরা শুধু যে নিজেদের উৎসর্গ করে দেন তা নয়, তাঁরা স্কুলের বাচ্চাদের নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা অন্য কর্মকর্তাদের আসলে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই। সভ্য দেশ হলে, নিশ্চিতভাবে দেশের আইনে শিশু নির্যাতনের অপরাধে তাঁদের বিচার হতো।

অনেক বড় বিজয় নিয়ে আওয়ামী লীগ দেশ চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে। এক দিকে অসহিষ্ণু দায়িত্বজ্ঞানহীন ছাত্রলীগ, অন্য দিকে তৌহিদ জং মুরাদের মতো

সাংসদেরা; কত দ্রুত তারা সাধারণ মানুষের মন বিষিয়ে দিতে পারে, সেটা কি আওয়ামী লীগের নেতারা জানেন?

এই সরকার ব্যর্থ হলে আওয়ামী লীগের নেতারা পরের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের [illegible] আর কোনো সুযোগ নেই—তাদের যেন কোনোভাবে হতাশ করা না [illegible] দেশের ওপর অধিকার সবচেয়ে বেশি কিন্তু তাদেরই।

প্রথম আলো : ১৪ মে ২০০৯

বাংলাদেশে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র

যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক দিনের জন্য গিয়েছি, সেখানে হ্যারল্ড নামে একটা ছেলের খুব শখ আমাদের রান্না করে খাওয়াবে। তাকে অনেক দিন থেকে চিনি। এমআইটি নামের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে। ভদ্র, বিনয়ী ও সুদর্শন একটি ছেলে। খুব আগ্রহ নিয়ে তার বাসায় ডিনার করতে গিয়েছিলাম। হ্যারল্ড খুব ভালো রান্না করে সুস্বাদু কিছু খাওয়াবে সে জন্য নয়, সে আমাকে কথা দিয়েছে যে খাওয়ার পর আমাদের নিয়ে যাবে টোকামাক দেখাতে। বইপত্র আর ম্যাগাজিনে টোকামাক সম্পর্কে পড়েছি, টেলিভিশনে ছবি দেখেছি; নিজের চোখে দেখার একটা শখ ছিল। হ্যারল্ডের কল্যাণে আমার সেই শখ পূরণ হলো। ঘুরে ঘুরে আমরা সেই টোকামাক দেখলাম। এবার টোকামাকটি কী জিনিস, সেটা বলা দরকার।

বাংলাদেশের মানুষ গত কিছুদিনে 'পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র' কথাটি অনেকবার শুনেছে এবং আমার ধারণা, দেশের বেশির ভাগ মানুষ সেটা নিয়ে একধরনের আগ্রহ ও উত্তেজনা অনুভব করেছে। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, 'পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র' কথাটি ভুল, শুদ্ধ কথাটি হচ্ছে 'নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র'। পৃথিবীর সবকিছু তৈরি অণু-পরমাণু দিয়ে এবং আমাদের চারপাশের পরিচিত সব শক্তি আসে এই অণু-পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে। আমরা যখন ম্যাচের কাঠি জ্বালাই, তখন সেই শক্তিটা আসে পরমাণুর বিক্রিয়া থেকে—সেই অর্থে সেটাও পারমাণবিক শক্তি। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। যখন সেই নিউক্লিয়াস ভেঙে কিংবা জুড়ে দিয়ে তার ভেতর থেকে শক্তি বের করে আনা হয়, সেটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ার শক্তি। এবং এই নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে বের করে আনা

শক্তি দিয়ে যখন বৈদ্যুতিক কেন্দ্র তৈরি করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র। কোনো একটা বিচিত্র কারণে পৃথিবীর সব জায়গাতেই—নিউক্লিয়ার শক্তি বোঝাতে পারমাণবিক শক্তি—এই ভুল কথাটি অবলীলায় ব্যবহার করা হয়। (আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ রকম অনেক ভুল শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করি। দুই পক্ষের গোলাগুলিতে মাঝখানে আটকা পড়ে গুলিবিদ্ধ হওয়ার নাম 'ক্রসফায়ার'। আমাদের দেশে 'ক্রসফায়ার' শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে বিনা বিচারে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় একজন মানুষকে হত্যা করা। বর্তমান সরকার কথা দিয়েছিল, তারা বিনা বিচারে মানুষকে হত্যা করা বন্ধ করবে—সেটা বন্ধ হয়নি। দেখে মনে হচ্ছে, সরকারের ভেতর আরেকটা সরকার আছে, তারা এত দুর্বিনীত ও বেপরোয়া যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতেও দ্বিধা করে না।)

যা-ই হোক, নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে কথা হচ্ছিল। বলা হয়েছে, ভারী নিউক্লিয়াস ভেঙে বা হালকা নিউক্লিয়াস জুড়ে দিয়ে নিউক্লিয়ার শক্তি পাওয়া যায়। যখন ভারী নিউক্লিয়াস (যেমন ইউরেনিয়াম) ভাঙা হয়, তখন দেখা যায়, ভাঙা টুকরোগুলোর ভর মূল নিউক্লিয়াসের ভরের চেয়ে কম এবং যেটুকু ভর কমে যায় সেটা আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E=mc^2$ হিসেবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। হিরোশিমায় যে বোমা ফেলে এক মুহূর্তে লাখ খানেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, সেই বোমায় এই প্রক্রিয়ায় শক্তি বের করা হয়েছিল। এ পদ্ধতির নাম Fission এবং পৃথিবীর সব নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে এ পদ্ধতিতেই শক্তি তৈরি করা হয়।

দুটি হালকা নিউক্লিয়াস (যেমন হাইড্রোজেনের আইসোটোপ) জুড়ে দিয়ে অন্য একটি নিউক্লিয়াস তৈরি করে যখন শক্তি তৈরি করা হয়, সেটাকে বলা হয় Fusion, এখানেও দেখা যায়, তৈরি করা নিউক্লিয়াসের ভর হালকা দুটি নিউক্লিয়াসের ভরের চেয়ে কম এবং যেটুকু ভর কমে যায় সেটা আইনস্টাইনের $E=mc^2$ অনুযায়ী শক্তি হিসেবে বের হয়ে যায়। সূর্যে এই প্রক্রিয়া দিয়ে শক্তি তৈরি হয়। অল্প একটু ভর ব্যবহার করে অনেক শক্তি পাওয়া যায় বলে সূর্যের জ্বালানি হঠাৎ করে একদিন শেষ হয়ে যাবে, আমাদের এমন দুশ্চিন্তা করতে হয় না। এ পদ্ধতিতে এখনো কোনো নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র তৈরি করা যায়নি। এটা করার জন্য যে তাপমাত্রার দরকার হয়, সেটা ধারণ করার মতো কোনো পাত্র নেই। তাই চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে প্রক্রিয়াটা করার চেষ্টা করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে যেখানে এ রকম চৌম্বক ক্ষেত্রে ফিউশন করার চেষ্টা করা হয়, সেটাই হচ্ছে টোকামাক। এমআইটিতে আমি এ রকম একটা টোকামাক দেখতে গিয়েছিলাম। এই ফিউশন পদ্ধতিতে শক্তি তৈরি করার জন্য পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ মিলে ফ্রান্সে ITER নামে একটা বিশাল প্রজেক্ট হাতে

নিয়েছে। ধারণা করা হয়, পৃথিবীর মানুষ যদি এ প্রক্রিয়ায় শক্তি তৈরি করার প্রযুক্তিটি জেনে যায়, তাহলে আমাদের পৃথিবীর জ্বালানির জন্য হাহাকার পুরোপুরি মিটে যাবে। আমরা তখন একটা নতুন পৃথিবী দেখব, যেখানে শক্তি বা বিদ্যুতের জন্য আর কোনো দুর্ভাবনা থাকবে না।

এটুকু ছিল ভূমিকা (ভূমিকাটা একটু বড়ই হয়ে গেল), এবার মূল বক্তব্যে আসি।

দুই.

একটা দেশ কতটুকু উন্নত সেটা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে, সেই দেশে কতটুকু বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় তার একটা হিসাব নেওয়া। যে দেশ যত উন্নত, সেই দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার তত বেশি। কথাটা উল্টোভাবেও বলা যায়, যে দেশে যত সহজে বিদ্যুৎ দেওয়া যায়, সেই দেশ তত দ্রুত উন্নত হয়ে ওঠে। কাজেই আমরা যদি আমাদের দেশের উন্নতি করতে চাই, তাহলে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য, গত জোট সরকারের আমলে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎও উৎপাদন হয়নি। অসংখ্য বিদ্যুতের খাম্বা তৈরি হয়েছে। এর চেয়ে উৎকট রসিকতা আর কিছু হতে পারে কি না, আমার জানা নেই।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে হয় এবং সেই বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানোর জন্য জ্বালানির দরকার হয়। আমাদের দেশের প্রধান জ্বালানি হচ্ছে গ্যাস। সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান নির্বাচনে জিতেই বলেছিলেন, এ দেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে এবং সেই গ্যাস বিদেশে রপ্তানি করার জন্য তিনি লাফঝাঁপ দেওয়া শুরু করেছিলেন। দেশের মানুষ রীতিমতো পথে নেমে আন্দোলন করে সেই ষড়যন্ত্র বন্ধ করেছিল। এখন আমরা দেখছি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ছবি—বিদেশে রপ্তানি দূরে থাক, দেশের জন্যই যথেষ্ট গ্যাস নেই, দ্রুত গ্যাস শেষ হয়ে আসছে। দেশের প্রয়োজন মেটাতে যদি নতুন গ্যাসক্ষেত্র পাওয়া না যায়, আমাদের প্রধান জ্বালানি যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে দেশটি চলবে কীভাবে?

দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এখনই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই, কিন্তু তার পরও এ দেশের মানুষের টিকে থাকার ক্ষমতা দেখে অনুভব করতে পারি, যদি তাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎটুকু সরবরাহ করা হয় তাহলে ১০ বছরের মধ্যে এ দেশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই যেকোনো মূল্যে আমাদের দেশের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে।

যে দেশে অন্য কোনো জ্বালানি নেই, সেই দেশের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র; এ ধরনের একটা কেন্দ্র থেকে অনায়াসে ৬০০ থেকে ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সবাই দেখেছে,

কিছুদিন আগে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপনসংক্রান্ত একটা চুক্তি হয়ে গেছে।

পরবর্তী প্রশ্ন : আমাদের দেশের জন্য নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র কি একটা যথাযথ সমাধান? বাংলাদেশের জন্য এ প্রশ্নের উত্তর কে ঠিক করেছেন? কিছু আমলা, নাকি বিশেষজ্ঞরা?

তিন.

আমাদের দেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেন আমলারা। আমি এর ঘোরবিরোধী। কেন বিরোধী, সেটা বোঝানোর জন্য কয়েকটা উদাহরণ দিই। একটা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষা। সেই শিক্ষা 'সংস্কার' করার জন্য হাজার কোটি টাকা খরচ করে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (হাজার কোটি লিখতে হলে একের পরে কয়টা শূন্য বসাতে হয় সেটা সবাই জানে না!)। সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে—একমুখী শিক্ষা, পাঠ্যবইয়ের বেসরকারীকরণ এবং স্কুল বেসড অ্যাসেসমেন্ট (এসবিএ, যেটাকে ছাত্রছাত্রীরা টিটকারি করে বলে 'স্যারের বাসায় এসো')। এর মধ্যে কিছু ঠেকানো গেছে, কিছু আধাখ্যাঁচড়া অবস্থায় আছে, কিছু গলার মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। এ রকম আরও একটা প্রজেক্ট ছিল কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন—অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এটা চমৎকার একটা পদ্ধতি। এ দেশের শিক্ষাবিদেরা এটা সাদরে গ্রহণ করেছেন। প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এর নতুন নামকরণ করেছেন 'সৃজনশীল প্রশ্ন'। এ রকম চমৎকার একটা প্রক্রিয়া এমনভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছিল যে, এটা জন্মানোর আগেই মৃত্যুবরণ করত। অনেক কষ্ট করে সেটা ঠেকানো গেছে। কারণ, আমলা নন এ রকম কিছু মানুষ সেটাকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আশির দশকে কিছু আমলা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমাদের দেশের জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজন নেই। কারণ, তাহলে দেশের তথ্য বাইরে পাচার হয়ে যাবে। দু-একজন মানুষের নির্বুদ্ধিতার কারণে পুরো দেশ প্রায় এক যুগ পিছিয়ে গিয়েছিল। এ রকম উদাহরণ কতগুলো প্রয়োজন?

আমলারা যে ইচ্ছে করে এ রকম সিদ্ধান্ত নেন তা নয়, অনেক সময় তাঁদের কিছু করার থাকে না। পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে কিছুদিন কাজ করে একজন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চলে আসেন, ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ে। কীভাবে কীভাবে জানি আমি বিটিসিএলের একজন বোর্ড মেম্বার, অল্প কিছুদিনে সেখানে তিন-তিনজন চেয়ারম্যান বদল হয়েছেন। কিছু বোঝার আগেই একজন বোর্ড মেম্বার বদল হয়ে আরেকজন চলে আসেন। সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আমি চেঁচামেচি করেছিলাম বলে আমাকে একবার একটা মিটিংয়ে ডাকা হয়েছিল। সেখানে

উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কথা আমার আলাদাভাবে মনে আছে। তার কারণ, তিনি ছিলেন সবচেয়ে সরব এবং একটা অবস্থা মেনে নেওয়ার জন্য তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'যদি কোনো মেয়ে আবিষ্কার করে যে সে ধর্ষিত হতে যাচ্ছে এবং তার বাঁচার কোনো উপায় নেই, তাহলে তার জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ধর্ষণটাকে উপভোগ করা।' (এটা কোনো মৌলিক কথা নয়, একজন আমেরিকান রাজনীতিবিদ এ কথাটা বলে সারা পৃথিবীর ঘৃণার পাত্র হয়েছিলেন)। কিছুদিন আগে আমি টেলিভিশনে দেখেছি, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মন্ত্রণালয়ের জন্য অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে বক্তব্য দিচ্ছেন। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে অসংখ্যবার বিদেশ গেছেন, এখন তিনি তাঁর সব জ্ঞানভান্ডার আর অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মন্ত্রণালয়ের জন্য কাজ করছেন। এর অর্থ, আমাদের আমলারা আসলে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নন। নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুযোগ নেই, তাঁরা কিছুদিন এক জায়গায়, কিছুদিন অন্য জায়গায় কাজ করেন।

যাঁরা কাজের মানুষ, তাঁরা সম্ভবত সব জায়গাতেই কাজ করতে পারেন। অ্যাপল কম্পিউটার তৈরি করে যে মানুষটি পৃথিবীতে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের বিপ্লব শুরু করেছিলেন, সেই অ্যাপল কোম্পানি তাঁকে বহিষ্কার করে পেপসি কোলার একজন কর্তাব্যক্তিকে নিয়ে এসেছিল। পেপসি কোলার মানুষ কম্পিউটারের ব্যবসা বেশ ভালোভাবেই চালিয়ে নিয়েছিল। তাই পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আমলা সম্ভবত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও ভালোভাবেই চালিয়ে নিতে পারবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা হবে রুটিন কাজ। কিন্তু রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত তাঁরা সঠিকভাবে নিতে পারবেন না; সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাঁদের সত্যিকারের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে হবে, দেশের মানুষের অনুমতি নিতে হবে।

আমাদের দেশের বিদ্যুতের জন্য পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র (আসলে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র) বসানোই সার্বিক পরিকল্পনা কি না, সেই সিদ্ধান্ত যেন এ দেশের দু-একজন আমলা না নিয়ে বসে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, লাভ-ক্ষতির কথা দেশের মানুষকে জানাতে হবে। একটা দেশের জন্য এটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত।

চার.

আমি কেন বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি? কারণগুলো এ রকম: সারা পৃথিবীতে এখন 'সবুজ আন্দোলন' হচ্ছে। সবুজ আন্দোলন বলতে বোঝানো হয় পরিবেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আন্দোলন। এ মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে পরিবেশের ওপর সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হচ্ছে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা

অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়া। বাতাসে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায়, তাহলে সেটা আলাদাভাবে তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে। পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায়, তাহলে মেরু অঞ্চলের জমে থাকা বরফ গলতে থাকবে, সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীতে যে কয়টি দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মধ্যে বাংলাদেশের নাম সবার আগে। দেশের অর্ধেক অংশ পানিতে ডুবে যাবে, না হয় লোনাপানির আওতায় চলে যাবে। পৃথিবীর এত বড় বিপর্যয় বন্ধ করার জন্য সারা বিশ্বের মনুষই এখন সোচ্চার। তাই তেল-গ্যাস বা অন্য কিছু না পুড়িয়ে শক্তিকেন্দ্র তৈরি করার দিকে সবাই নতুন করে নজর দিয়েছে। সেই হিসেবে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র খুব আকর্ষণীয় সমাধান, কোনো কার্বন ডাই-অক্সাইড জন্ম না দিয়েই এটা শত শত মেগাওয়াট শক্তি তৈরি করতে পারে। পৃথিবীতে বেশ কিছু দেশ অত্যন্ত সফলভাবে এই শক্তি তৈরি করে যাচ্ছে। ফ্রান্স এর অত্যন্ত চমৎকার এক উদাহরণ। তাদের শক্তির একটা বড় অংশ আসে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র থেকে। তবে আমার সবচেয়ে পছন্দের উদাহরণ হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত। নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর কারণে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতকে সারা পৃথিবী একঘরে করে রেখেছিল, তাতে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজেদের বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের দিয়ে নিজের দেশের উপযোগী একেবারে ভিন্ন রকম নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র তৈরি করেছে। বাইরে থেকে জ্বালানি না এনেই নিজের দেশের নতুন ধরনের জ্বালানি দিয়ে তারা তাদের নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রগুলো চালাচ্ছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি (শতাধিক) নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পৃথিবীর সব দেশের মতো তাদের দেশেও শক্তির চাহিদা বাড়ছে, তার পরও গত ৩০ বছরে তারা তাদের দেশে একটাও নতুন নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করেনি। বলা হয়, কারণটা রাজনৈতিক (তার মানে কী আমি জানি না)। সাদা কথায় বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ বিশাল একটা ভূখণ্ডের মালিক হওয়ার পরও তাদের দেশে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র বসাতে স্বস্তি বোধ করে না। জার্মানির মতো দেশ তাদের মাটিতে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার কারণটা কী? তার কারণ, আজকাল সবাই মনে করে যে এটা পরিবেশের জন্য একটা হুমকি।

নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রকে পরিবেশের জন্য হুমকি মনে করার প্রধান কারণ এর বর্জ্য। এ ধরনের শক্তিকেন্দ্র ব্যবহার করার পর জ্বালানির যে অংশটুকু বর্জ্য হিসেবে পড়ে থাকে, সেটা তেজস্ক্রিয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে আসে, কাজেই নির্দিষ্ট একটা সময় এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো আলাদা করে সুরক্ষিত জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয়। সেই নির্দিষ্ট সময়টুকু কত? উত্তরটা শুনে সবাই চমকে উঠবে, সময়টুকু এক-দুই সপ্তাহ নয়,

এক-দুই মাস বা বছর নয়, টানা ১০ হাজার বছর। মানুষের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ১০ হাজার বছর টিকে থাকা কোনো কিছু তৈরি করার উদাহরণ নেই। (তেজস্ক্রিয় পদার্থের আয়ু আরও অনেক বেশি, অনায়াসে লাখ বছর হয়ে যেতে পারে)।

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ছবিটি আসলে নিউক্লিয়ার বর্জ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে তাদের নিউক্লিয়ার বর্জ্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছে, তার বর্ণনাটি পড়লে যেকোনো মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠবে। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা কিছু বর্জ্য তৈরি করে যাচ্ছি, হাজার হাজার বছর পরও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ঝুঁকি সহ্য করে বেঁচে থাকতে হবে, এটা অনেক বড় এক নৈতিক প্রশ্ন।

আমাদের বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা হলে, সেখান থেকেও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বের হবে। সেই বর্জ্য আমরা কোথায় রাখব? মাঝেমধ্যেই খবরের কাগজে দেখি, ভয়ানক বর্জ্য দিয়ে দূষিত পুরোনো জাহাজ সারা পৃথিবী থেকে পরিত্যক্ত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে ভাঙার জন্য। নিউক্লিয়ার বর্জ্যের বেলায়ও সে রকম কিছু হবে না তো? সারা পৃথিবীর নিউক্লিয়ার বর্জ্য আমাদের দেশে সংরক্ষণ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে না তো? যাঁরা আমাদের বুড়িগঙ্গা নদীটি দেখেছেন, তাঁরা জানেন আমরা এর কী অবস্থা করেছি। বুড়িগঙ্গার পানি এখন আর পানি নয়, এটা থিকথিকে কালো আঠালো দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত একধরনের তরল। লোভী ব্যবসায়ী, দুর্বল আমলা আর অবিবেচক মানুষ মিলে আমরা নদীকে হত্যা করতে পারি। নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে সে রকম ভয়াবহ কিছু ঘটবে না তো?

কিছুদিন আগেও একটা নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে কয়েক যুগ লেগে যেত। আজকাল প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন পাঁচ-ছয় বছরেই একটা নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র বসানো যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এর আয়ুষ্কাল কিন্তু ৩০ বছরের মতো। নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করার প্রক্রিয়া যে রকম জটিল, আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর সেটা পরিত্যাগ করা বা নতুন করে তৈরি করার প্রক্রিয়া কিন্তু একই রকম জটিল। কাজেই নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রটির অবস্থা ৩০ বছর পর কী হবে? (ভবদহের কথা মনে আছে? প্রকল্পটি ৩০ বছরের কাছাকাছি সময়সীমার জন্য ছিল। সেই সময়টুকু পার হওয়ার পর পুরো এলাকার মানুষের জন্য কী ভয়ানক দুর্ভোগ নিয়ে এসেছিল মনে আছে?) কাজেই একটা নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা হলেই কাজ শেষ হয় না, সেটা সংরক্ষণ করতে হয় এবং সময় শেষ হলেই সেটা ঠিকভাবে পরিত্যাগ করার বিশাল একটা ঝুঁকি সামলাতে হয়।

নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে কত খরচ পড়ে? আমি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নই, তাই ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে জানতে পেরেছি—পাঁচ থেকে ১০

বিলিয়ন ডলার, টাকার অঙ্কে তিন থেকে ছয় হাজার কোটি টাকা। টাকাটা কোথা থেকে আসবে, কী সমাচার, সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন দেশের নীতিনির্ধারকেরা, দেশের অর্থনীতিবিদেরা।

নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের বড় দুটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাশিয়ার চেরনোবিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের থ্রি মাইল আইল্যান্ডে। মনে রাখতে হবে, নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনা কিন্তু অন্য দশটা দুর্ঘটনার মতো নয়। প্রচণ্ড উত্তাপে যখন চুল্লিটি গলে যায়, তখন তার ভেতরকার ভয়ংকর তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসে উড়ে যায়, পানিতে মিশে যায়। সেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ লাখ লাখ বছর ধরে বিকিরণ করে, কেউ সেখানে যেতে পারে না। রাশিয়ার চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর পুরো শহরটাই বাতিল করে দিতে হয়েছিল। চেরনোবিল এবং থ্রি মাইল আইল্যান্ড ছিল বড় দুর্ঘটনা। গণমাধ্যমে সেভাবে আসেনি—এ রকম ছোট দুর্ঘটনার উদাহরণ কিন্তু অসংখ্য। পৃথিবীর যেকোনো প্রযুক্তিতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গাড়িতে নিয়মিত দুর্ঘটনা হয়, জাহাজ ডুবে যায়, বিমান মাটিতে আছড়ে পড়ে, ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে, স্পেস শাটল মহাকাশে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তার পরও মানুষ দুর্ঘটনাকে ভয় পেয়ে থেমে থাকে না। তারা গাড়ি, জাহাজ কিংবা বিমানে চড়ে, ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, স্পেস শাটলে করে মহাকাশে যায়। নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে দুর্ঘটনা হতে পারে জেনেও মানুষ নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করে। চেষ্টা করে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমাতে। কিন্তু কখনো দুর্ঘটনা হবে না—কেউ সেই গ্যারান্টি দিতে পারে না।

পাঁচ.

কাজেই আমাদের এই দরিদ্র দেশের যৎসামান্য সম্পদ ব্যবহার করে দেশের মানুষের একটা বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার ইচ্ছা, আমলারা যেমন করে একমুখী শিক্ষা বা স্কুল বেসড অ্যাসেসমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকেন, এবার যেন সেটা না ঘটে। দু-চারজন আমলা কিংবা ইন্টারনেটে দুই পাতা পড়ে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা বিশেষজ্ঞরা যেন এই সিদ্ধান্ত না নেন। আমাদের দেশের অনেক বড় বড় বিশেষজ্ঞ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের সম্মিলিত চিন্তাভাবনা জেনে এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যেন সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়। নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে যত খরচ হয়, তার প্রায় মাত্র ১০ ভাগের এক ভাগ খরচ করে অস্ট্রেলিয়া নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের চেয়েও বেশি মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে। অপ্রচলিত প্রযুক্তির ঝুঁকি হয়তো বাংলাদেশ নিতে পারবে না, তার পরও যেন সেগুলো বিবেচনা করা হয়।

যেকোনো মূল্যে আমাদের বিদ্যুৎ দরকার। যদি দেখা যায়, সত্যিই নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করাই হচ্ছে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান, তাহলে আমরা যেন

পাশাপাশি আরেকটা কাজ করি। আমরা যেন বিদেশ থেকে শুধু একটা যন্ত্র কিনে এনে দেশে বসিয়ে না দিই। আমরা যেন নিউক্লিয়ার শক্তিসংক্রান্ত প্রযুক্তিতে আমাদের দেশের নিজেদের জনশক্তি গড়ে তুলি। ভারত থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম মিশিয়ে নিজেদের প্রযুক্তিতে ফুয়েল রড তৈরি করেছে। আমাদের কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম-জাতীয় খনিজ পাওয়া গেছে। এ রকম একটা তথ্য প্রচলিত আছে। সে জন্য কক্সবাজারে আণবিক শক্তি কমিশনের একটা অফিসও তৈরি করা হয়েছে বলে জানি। আমরা যেন নতুন করে সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করি। আমাদের সমুদ্র উপকূলে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের জ্বালানি যদি পেয়ে যাই, তার চেয়ে চমৎকার ব্যাপার আর কী হতে পারে! পৃথিবীতে কিন্তু ইউরেনিয়ামের খুবই অভাব—যাঁরা নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের বিরোধিতা করেন, তাঁরা এটাকে একটা বড় যুক্তি হিসেবে দেখান।

আমাদের বিদ্যুৎ দরকার, যেকোনো মূল্যে বিদ্যুৎ দরকার। যদি নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করেই সেটা পেতে হয়, তাহলে সেই সিদ্ধান্তই আমাদের নিতে হবে।

তবে আমি স্বপ্ন দেখি, আমরা আমাদের নিজেদের বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদ গড়ে তুলব। পাশের দেশ ভারত যেভাবে নিজেদের শক্তিকেন্দ্রগুলো গড়ে তুলেছে, আমরাও সেভাবে একদিন নিজেদের শক্তিকেন্দ্র গড়ে তুলব। কক্সবাজারের সমুদ্র উপকূল থেকে শুধু ঝিনুক কুড়াব না, আমরা থোরিয়াম-ইউরেনিয়াম কুড়িয়ে নিজেদের জ্বালানি নিজেরা তৈরি করে নেব।

আমরা স্বপ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই, কিন্তু শুধু স্বপ্নে থেমে থাকতে চাই না।

প্রথম আলো : ১১ জুন ২০০৯

পিলখানা ট্র্যাজেডি

খবরের কাগজে আমি যখন ছবিটা দেখেছিলাম, তখনই বুঝেছিলাম যে এই ছবির দৃশ্যটা সারা জীবনের মতো আমার স্মৃতিতে গেঁথে গেছে এবং আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন কখনোই এ ছবির কথা ভুলতে পারব না। ছবিটিতে একজন সুদর্শন সেনা কর্মকর্তা মাটিতে শুয়ে আছেন, তাঁর প্রশস্ত বক্ষে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদছেন তাঁর স্ত্রী। যে প্রশস্ত বক্ষ সারাটি জীবন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সব বিপদ-আপদ থেকে ভালোবাসা আর মমতা দিয়ে আগলে রেখেছিল, সেখানে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন—ওই ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাঁর দেহ প্রাণহীন এবং শীতল, সেখানে এখন শুধু হাহাকার আর হাহাকার। এটা মাত্র একজন সেনা কর্মকর্তার ছবি; ঠিক এ রকম আরও অর্ধশত সেনা কর্মকর্তার দেহ পিলখানার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। অন্যান্য মানুষসহ মোট প্রাণ হারিয়েছেন ৭৫ জন। আমরা মৃত্যুর উপত্যকায় বাস করি—এখানে যেকোনো বাস-ট্রাক দুর্ঘটনায় অনায়াসে ২০-২৫ জন মারা যায়, লঞ্চডুবিতে কয়েক শ মানুষ মারা যায়, ঘূর্ণিঝড়ে মারা যায় কয়েক হাজার। মৃত্যু দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত। তার পরও এই মৃত্যুগুলো দেখে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি, কারণ এগুলো অন্য মৃত্যুর মতো নয়, এগুলো হত্যাকাণ্ড—ঠান্ডা মাথায় একজন একজন করে হত্যা করা হয়েছে। শুধু হত্যা করেই শেষ হয়নি, মৃতদেহগুলো বিকৃত করে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদের কথা জানি না, এই হত্যাকাণ্ডে আমি আমার বিশ্বাসের মূলে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি খেয়েছি। আমি সব সময়ই বিশ্বাস করে এসেছি, মানুষের ভেতরে থাকে মায়া-মমতা ও ভালোবাসা। যত দুঃসময়ই হোক, এই শাশ্বত অনুভূতিগুলো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই হঠাৎ করে যখন দেখি মানুষের ভেতর

হঠাৎ করে একধরনের দানব এসে জন্ম নিয়েছে এবং সেই দানবগুলো নির্বিচারে এ দেশের সন্তানদের পৈশাচিক নৃশংসতায় হত্যা করছে, তখন আমি সেটা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমরা এ রকম হত্যাকাণ্ড দেখেছিলাম ১৯৭১ সালে, যখন বদর বাহিনী এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের একজন একজন করে খুঁজে বের করে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছিল। এ দেশের জন্য সেই মানুষগুলোর কোনো মমতা ছিল না, দেশটাকে মেধাশূন্য করার জন্য তারা সেই পৈশাচিক পরিকল্পনাটি করেছিল। এ মুহূর্তে তদন্ত হচ্ছে এবং আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছি, বলছি, সত্য বের হয়ে আসুক। আমরা যেন দেখতে পাই, সাধারণ মানুষ দানব নয়, তাদের ভেতরে এখনো মানুষের জন্য ভালোবাসা আছে, মমতা আছে। আমরা যেন দেখতে পাই, এ দেশের জন্য মমতা নেই এমন কিছু মানুষ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে—যেন এটা একটা ষড়যন্ত্র। সাধারণ মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে আমরা কেমন করে বেঁচে থাকব!

দুই.

২৫ ফেব্রুয়ারিতে পিলখানার ওই ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞের সবচেয়ে বড় বলি হচ্ছে সেখানে আটকে থাকা সেনা কর্মকর্তাদের সন্তানেরা। ঘটনার দিন পিলখানার চার দেয়ালের মাঝে সেই শিশুগুলো আটকা পড়েছিল। ভেতরে গোলাগুলি হচ্ছে, তাদের আপনজনকে তাদের সামনেই ধরে নিয়ে মেরে ফেলছে, ঘরবাড়ি লুট করছে, প্রিয়জনকে অপমান করছে, নির্যাতন করছে, তার মধ্যেই এই ছোট শিশুগুলো আটকা পড়ে আছে—সেই মুহূর্তগুলোর কথা চিন্তা করতেই আমার বুক ভেঙে যায়। তাদের মনের ভেতর সেই ভয়ংকর স্মৃতিগুলো নিশ্চয়ই গেঁথে গেছে এবং তা থেকে তারা কত দিনে কেমন করে মুক্তি পাবে, আমি জানি না। আমি একজনের কথা জানি, যিনি একবার ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিলেন। যখন তাঁকে অস্ত্রের মুখে ছিনতাই করা হচ্ছে, তখন পাশ দিয়ে ঝিকঝিক করে একটা ট্রেন চলে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি ছিনতাইকারীর হাত থেকে মুক্তি পেলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো ব্যাপারটি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে সেটা সত্যি নয়। এর পর থেকে যখনই তিনি ট্রেনের শব্দ শুনতেন, তখনই তিনি আতঙ্কে চমকে উঠতেন এবং সেই ভয়ংকর স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যেত। আমি মনোবিজ্ঞানী নই, তার পরও আমি অনুমান করতে পারি, সেই ভয়াবহ সময়ে পিলখানায় আটকে পড়া শিশুদের ভেতরে বড় ধরনের মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে তাদের নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন লেগে যাবে।

পিলখানার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয়ভাবে খুব গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া হয়েছে—আমি আশা করব, সেই শিশুদের ব্যাপারটিও যেন অনেক গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া হয়। শিশু, কিশোর-কিশোরী কিংবা তাদের আত্মীয়স্বজনের যেন দক্ষ-

অভিজ্ঞ ও স্নেহশীল মনোবিজ্ঞানীদের দিয়ে কাউন্সেলিং করা হয়। স্বজন হারানোর বেদনা থেকে তারা কখনোই মুক্তি পাবে না, কিন্তু সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা থেকে তারা যেন মুক্তি পায়, স্বাভাবিক জীবন শুরু করতে তাদের যেন কোনো সমস্যা না হয়।

তিন.

পিলখানার হত্যাকাণ্ডটি হঠাৎ করে ঘটে গেছে, নাকি এটা একটা বিশাল ষড়যন্ত্রের ফল, তা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে এর আগে এ রকম গুরুতর কোনো বিষয় নিয়ে কোনো তদন্ত হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পর এক তদন্ত কর্মকর্তা বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ নিজেরাই নিজেদের বোমা মেরেছে! এর আগে রমনার বটমূল, উদীচীর অনুষ্ঠান এবং পল্টনের জনসভায় বোমা হামলা হয়েছে, ৬৪ জেলায় একসঙ্গে বোমা ফাটানো হয়েছে, চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র ধরা পড়েছে, বগুড়ায় রীতিমতো গুলির খনি আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু আমরা সবিস্ময়ে দেখেছি, কোথাও বিষয়গুলোর তদন্ত হয়নি, বরং ঘটনাগুলো ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকার নিজে যখন কোনো ঘটনা ধামার তলায় চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন সেখান থেকে সেটা দিনের আলোয় প্রকাশ করা খুব সোজা ব্যাপার নয়।

আমার মনে হচ্ছে, অনেক দিন পর আমরা একটা অত্যন্ত গুরুতর ঘটনার তদন্ত হতে দেখছি। সারা জাতি গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই তদন্তের প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছে।

তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশ পাওয়ার আগেই পত্রপত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনে আমরা কিছু কিছু বিষয় জেনে গেছি, যার কয়েকটা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। সেনা কর্মকর্তারা যখন টের পেলেন তাঁদের মেলে ফেলা হবে, তখন তাঁরা সবাই টেলিফোনে বাইরে যোগাযোগ করেছিলেন। যখন সত্যি সত্যি হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল, তখন তাঁদের ভেতর যাঁরা প্রাথমিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, তাঁরা নানাভাবে নিজেদের রক্ষা করে বাইরে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। আমরা জানি, সেনাবাহিনী বা অন্য কোনো বাহিনী তাঁদের সাহায্য করতে যায়নি। সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না ভুল ছিল, সঠিক বা ভুল যা-ই হোক, সিদ্ধান্তটা কি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া সিদ্ধান্ত নাকি একক সিদ্ধান্ত, কিংবা সিদ্ধান্তটা অন্যভাবে নেওয়া হলে কি আরও বেশি মানুষকে বাঁচানো যেত নাকি আরও বেশি মানুষ মারা যেত, আমরা সেটা জানি না। বিশেষজ্ঞরা তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি শুধু সেটা বোঝার চেষ্টা করি।

আমি অন্য কিছু না বুঝলেও মানবিক ব্যাপারটা বুঝতে পারি। মৃত্যুর মুখোমুখি সেনা কর্মকর্তা আর তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বসে আছেন, সাহায্যের জন্য

অপেক্ষা করছেন, কিন্তু সাহায্য আসছে না। যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের পরিবার ও আপনজনের ক্ষোভটুকু আমি অনুভব করতে পারি। সেই ক্ষোভটুকু বুকে চেপে রেখে সেনাবাহিনী যে ধৈর্য, সংযম ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা দেখিয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই এবং আমার ধারণা, সে কারণে আমরা খুব বড় একটা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছি। সিলেটে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই বিডিআরের ক্যাম্প, ২৬ তারিখ ভোরবেলা থেকেই সেখানে গোলাগুলি শুরু হয়েছিল এবং সারা দেশে নিশ্চয়ই সেই একই ব্যাপার ঘটেছিল। যদি পিলখানায় সেনাবাহিনী ও বিডিআরের মধ্যে একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হতো, সেটা কি মুহূর্তের মধ্যে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত না? সেই মহাদুর্যোগ শুরু হলে আমরা কোথায় যেতাম?

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, শুধু অনুমান করতে পারি, এ দেশের জন্য যাদের কোনো মমতা নেই তারা যে ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছিল, এ দেশের সরকার কিংবা সেনাবাহিনী সেই ফাঁদে পা না দিয়ে দেশটাকে অনেক বড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। সে জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী, এ দেশের সরকার, সেনাবাহিনী, বিশেষ করে সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

চার.

পিলখানার হত্যাযজ্ঞ ঘটে যাওয়ার পর আমার সঙ্গে অনেকে যোগাযোগ করে লিখতে বলেছে। মাঝেমধ্যে পত্রপত্রিকায় লিখি বলে অনেকের ধারণা, আমি হয়তো অনেক কিছু জানি এবং যেকোনো ঘটনা ঘটলেই বুঝি সেটা নিয়ে লিখতে পারব। এটা সত্যি নয়, এ রকম একটা ঘটনা বিশ্লেষণ করে লেখার ক্ষমতা আমার নেই। যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেগুলো দেখে নিজের ভেতরে শুধু প্রশ্নই জমা হয়েছিল। আমার মনে আছে, পিলখানার গণকবর থেকে সেনা কর্মকর্তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করার পরও আমরা জানি, তখনো ৭০ জন সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু বিষয়টা আমাকে অসম্ভব বিচলিত করেছিল। একজন মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে সেটাই যথেষ্ট নয়, মৃত্যুর পর আপনজন তাঁর মৃতদেহটি সমাহিত করার সুযোগটাও পাবে না, সেটা কেমন কথা!

আমার মনে আছে, একপর্যায়ে আমি সংবাদপত্র অফিসগুলোয় টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম তারা কেন বড় বড় হেডলাইনে বিষয়টা ছেপে সবার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে না। তখন আমি জানতে পারলাম যে, ৭০ জন কর্মকর্তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা সত্যি নয়—আসলে সাতজন কর্মকর্তার খোঁজ তখনো পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা আমাকে অনেক বেশি বিভ্রান্ত করেছে—সেনা দপ্তরের মানুষজন এটা আগে থেকে জানেন না, তা হতেই পারে না। এ রকম ভয়ংকর দুর্যোগের সময় অন্য কোনোভাবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে হলেও সবাই

সবাইকে খুঁজে বের করে ফেলে। কাজেই এতজন সেনা কর্মকর্তা নিখোঁজ আছেন, সেই ভুল তথ্য দিয়ে কে এ দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল? কেন করেছিল?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন রাজনৈতিক নেতাদের রিমান্ডে নেওয়া হতো, তখন রিমান্ডে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের সিডি কীভাবে কীভাবে জানি সাধারণ মানুষের হাতে চলে আসত। রাজনৈতিক নেতারা গোপনে নিজেদের কথাবার্তা টেপ করে সিডি হিসেবে বের করে ফেলবেন, সেটা নিশ্চয়ই কেউ দাবি করবে না। কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এটা প্রকাশ করত আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীগুলোর কোনো কোনো সদস্য। বিডিআর-বিপর্যয়ের পরপর আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছিলেন, সেই বৈঠকের কথোপকথনও সিডি হিসেবে বের হয়ে গেছে। কে সেই সিডি বের করেছে? কেন বের করেছে? আমরা যে সরকার আছে বলে জানি, সেই সরকারের ওপরও কি আরেকটা সরকার আছে, যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে যা ইচ্ছে তা-ই করে ফেলে? সেই সরকারটা কারা চালায়?

আমাকে একজন সেই সিডিটা শুনতে দিয়েছেন। (এটা নাকি ইউ টিউবে আছে, তাই বাংলাদেশে ইউ টিউব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন জানে, এই দেশে ইউ টিউব বন্ধ করে দেওয়া হয়—দেশকে পৃথিবীর সামনে অপদস্ত করার এটা খুব সহজ একটা প্রক্রিয়া।) সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সেই রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সিডিটা শোনা রাষ্ট্রীয় 'অপরাধ' কি না আমি জানি না, কিন্তু আমি সেটা শুনেছি এবং সেটা শোনার পর আমার ভেতরে আরও নতুন প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কম বয়সী, রক্তগরম তরুণ ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময়ই বড় বড় মানুষকে অনেক কিছু বলে ফেলে, কিন্তু সেনা কর্মকর্তারা কি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যা ইচ্ছে তা-ই বলতে পারেন? প্রধানমন্ত্রী কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্বপ্রাপ্ত নন? ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় তাঁরা কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করতে পারেন? সহকর্মীর মৃত্যু নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভের কারণে এক-দুটি আবেগতাড়িত কথা আমি বুঝতে পারি—কিন্তু ডিনারের দাওয়াত গ্রহণ করা না-করা নিয়ে তাঁরা কি এ ধরনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেন? হতে পারে, প্রধানমন্ত্রী নিজে তাঁদের ভেতরের ক্ষোভটুকু প্রকাশ করে হালকা হওয়ার জন্য সেই সুযোগটি করে দিয়েছিলেন এবং ভেতরে যা কথাবার্তা হয়েছিল সেটি একান্তভাবেই রুদ্ধদ্বারের ব্যক্তিগত কথাবার্তা। তাহলে কেন সেটি রুদ্ধদ্বারে বন্ধ থাকল না? কেন সেটি প্রকাশ পেল?

ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর সেখানে ঠিক কী ঘটেছিল, তার বর্ণনা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। সেখানে আমি বিস্ময়কর একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা সাধারণ জওয়ানদের সঙ্গে 'তুই তুই' করে কথা বলছেন? এটাই কি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, নাকি এটা একজন বিশেষ কর্মকর্তার একধরনের বদ

অভ্যাস? আমি চা-বাগানের ম্যানেজারদের সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে শুনেছি, এবং সেটা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। একজন মানুষ কি অন্য মানুষকে সব সময়ই সম্মান দেখাবে না? সেনা কর্মকর্তাদের এই আচরণ যদি নিয়মিত ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে কি ভবিষ্যতে অন্য কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না?

২৫ ফেব্রুয়ারি যেটা ঘটে গেছে, আমরা কখনোই সেটা ভুলে যেতে পারব না; যত দিন আমরা বেঁচে থাকব, তত দিন সেগুলো আমাদের তাড়া করে বেড়াবে। কিন্তু আর কখনোই যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেটা আমাদের যেকোনো মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে।

অপ্রকাশিত

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনা

খবরের কাগজে দেখেছি, ১৯ জুন বাংলাদেশে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হবে। যাঁরা ব্যাপারটা এখনো ভালো করে বুঝতে পারছেন না, তাঁদের সহজভাবে বোঝানো যায় এভাবে: বাংলাদেশে ১৯ জুন সূর্য উঠবে ভোর পাঁচটায়, কিন্তু ২০ জুন সূর্য উঠবে ভোর ছয়টায়।

আমি জানি, এ দেশের বেশির ভাগ মানুষের কাছেই ব্যাপারটা একটা ধাক্কা হিসেবে আসবে। ১৯৭৬ সালে যখন প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, তখন ঘড়ির কাঁটা ওলট-পালট করার ব্যাপারটা আমার কাছে একটা ধাক্কার মতো ছিল—আমি আবিষ্কার করেছিলাম, হঠাৎ করে অপরাহ্নে সূর্য ডুবে চারদিক অন্ধকার হয়ে যেতে শুরু করেছে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার এই পদ্ধতি সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটা মোটেও সহজ নয়। কেন নয়, সে সম্পর্কে আমার যুক্তিগুলো এ রকম:

ক. আমরা যদি ঘোষণা দিয়ে একদিন ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিই, তারপর রেডিও-টেলিভিশন ও খবরের কাগজে সাংঘাতিকভাবে প্রচার করে দেশের সব মানুষকে তাদের ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নিতে বাধ্য করি, তাহলেই কিন্তু আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না। শীতের শুরুতে আবার ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ প্রতিবছর দুবার করে আমাদের এই বিশাল দজ্ঞযজ্ঞ করে যেতে হবে বাকি জীবন!

খ. ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনা বলতে কী বোঝায়, সেটা বেশির ভাগ মানুষ জানে না—আমি অনেককে ফোন করেছি, সবাই উল্টো কথা বলেছে। সবার ধারণা, এখন সূর্য ডোবে সন্ধ্যা সাতটার দিকে, ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে

আনায় সূর্য ডুববে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে! এখনো যদি দেশের মানুষ ব্যাপারটা না বোঝে, তাহলে কখন এটা বোঝানো হবে? কেউ কেউ যদি এক দিকে পরিবর্তন করে, কেউ কেউ অন্য দিকে এবং কেউ কেউ গোঁয়ার্তুমি করে যদি কোনো দিকেই পরিবর্তন না করে, তখন কী হবে? এর চেয়ে বড় বিপর্যয় কী হতে পারে?

গ. খবরের কাগজে দেখেছি, স্কুল এর আওতায় পড়বে না। এটা একটা অবিশ্বাস্য খবর। বাংলাদেশের সবার ঘড়ি এক রকম, আর স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ঘড়ি অন্য রকম—এটা হতে পারে না। যাঁরা পত্রিকায় এ খবর ছাপিয়েছেন, তাঁরা ব্যাপারটা বুঝতেই পারেননি। এখনো যদি খবরের কাগজের মানুষের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাই ব্যাপারটা না বোঝেন, তাহলে অন্যরা কখন বুঝবে?

ঘ. যেসব দেশ এই পদ্ধতি ব্যবহার করে, তারা এটা করে বসন্ত ও শরৎকালে (মে ও অক্টোবর মাসে)। জুন একটু দেরি হয়ে গেছে—আবার আগের ঘড়িতে কখন ফিরে যাওয়া হবে, এখনো সেই ঘোষণা চোখে পড়েনি।

ঙ. আমাদের দেশ বিষুব রেখার কাছাকাছি (বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে), কাজেই দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য শীত ও গ্রীষ্মকালে খুব বেশি বড় ও ছোট হয় না। এ রকম দেশে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে ও পিছিয়ে কোনো বড় ধরনের লাভ হবে না।

চ. ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনা ও পিছিয়ে নেওয়া ঠিক করে কার্যকর করা খুব সহজ হবে না। অবধারিতভাবে প্রথম কয়েক দিন সারা দেশে একটা বড় ধরনের বিভ্রান্তি থাকবে। মানুষ ভুল সময়ে অফিসে যাবে, ট্রেন-বাস আগে ছেড়ে দেবে, স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীরা ভুল সময়ে যাবে, দোকানপাট-ব্যাংক ভুল সময়ে চালু থাকবে এবং সারা দেশে একটা গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। অবস্থাটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে না পারলে সরকারকে অনেক বড় ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়ে সেটা কার্যকর করতে না পেরে আবার পিছিয়ে আনা হলে সেটা এক ধরনের ব্যর্থতা হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। সরকার কেন এই ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে?

ঘড়ির কাঁটা আগানোর বিষয়টি এসেছে বিদ্যুৎ বাঁচানোর ভাবনা থেকে। আমার ধারণা, ঘড়ির কাঁটার পরিবর্তন না করে সরকার যদি গ্রীষ্মকালে সব অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান—সবাইকে এক ঘণ্টা আগে কাজ শুরু করে এক ঘণ্টা আগে শেষ করার নির্দেশ দেয়, তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফলটি পেয়ে যাবে অনেক সহজে। এর মধ্যে কোনো ধরনের বিপর্যয়ের ঝুঁকি নেই।

আমার ধারণা, ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে আনা (নাকি পিছিয়ে দেওয়া?) ধরনের কোনো পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ এখনো প্রস্তুত হয়নি। তার চেয়ে বড় কথা, সম্ভবত এর প্রয়োজনও নেই।

তার চেয়ে বরং সাপ্তাহিক ছুটির দিনটা কোন দিন হবে, সেটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হোক।

প্রথম আলো : ১২ জুন ২০০৯

তাজউদ্দীন আহমদের হাতঘড়ি

কিছুদিন আগে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের বাসায় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়ে সিমিন হোসেন রিমির মুখে শুনেছিলাম, তাঁর শরীরটা নাকি ভালো যাচ্ছিল না। আমাদের দেশে কারও শরীর খারাপ হলে হঠাৎ করে এত মানুষ এসে হাজির হয়ে যায় যে সেটা একধরনের বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। যাঁর শরীর খারাপ, শুভানুধ্যায়ীদের চাপে তাঁকে আরও বেশি হাঁপিয়ে উঠতে হয়। সিমিন হোসেন রিমি আমাদের অভয় দিল। বলল, আমরা যদি যাই, তাঁর ওপর আলাদা করে কোনো চাপ পড়বে না। সে জন্যই গিয়েছিলাম।

কারও বাসায় গিয়ে যতটুকু সময় থাকা ভদ্রতা, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় সেখানে বসেছিলাম। কারণ, সেই বাসায় গেলে আমি সব সময়ই খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে থাকি। আমার প্রায় বিশ্বাসই হতে চায় না যে, আমাদের এই দেশকে যুদ্ধ করে স্বাধীন করার পেছনে যে মানুষটির সবচেয়ে বেশি অবদান, সেই তাজউদ্দীন আহমদের আপনজনের কাছে আমি বসে আছি। এই ঘরের মানুষগুলো আসলে এ দেশের ইতিহাসের একটা অংশ, এই ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো আসলে এ দেশের ইতিহাস। তাঁরা মুখে যে কথাগুলো বলেন, সেগুলো আমরা ইতিহাস বইয়ে পড়ি, ইতিহাস বইয়ে লিখি। সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের সঙ্গে কথায় কথায় ২৫ মার্চের সেই রাতের কথা উঠে এল। গোলাগুলি শুরু হওয়ার পর তিনি তাঁর দুই ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে ওপরের তলায় উঠে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান আর্মির একজন অফিসার তাঁদের খোঁজ করার সময় তাঁর সঙ্গেই কথা বলেছিল, তিনি তাকে নিজের পরিচয় বুঝতে দেননি। বিশুদ্ধ উর্দুতে কথা বলে সেই অফিসারকে কীভাবে বিদায় করে ছোট মেয়ে মিমি

আর ছোট ছেলে সোহেলসহ নিজেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই গল্প করতে করতে এত দিন পরও তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল! (সেই ছোট ছেলেটি বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন, এখন পদত্যাগ করেছেন। মাহজাবিন মিমি খুব সুন্দর কবিতা লেখে। সেই রাতে অন্য দুই মেয়ে রিপি আর রিমি তাদের খালার বাসায় ছিল। রিপির ভালো নাম শারমিন আহমদ। বাচ্চাদের জন্য লেখা তার একটা অসাধারণ বই *হৃদয়ে রংধনু*-এর প্রকাশনা উৎসবে আমার হাজির থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। এ দেশে সিমিন হোসেন রিমিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। অন্য সবকিছু যদি ছেড়ে দিই, শুধু জেল হত্যার পেছনের ভয়ংকর ইতিহাসটুকু খুঁজে বের করার জন্য এই জাতি তাকে মনে রাখবে। প্রায়কিশোরী একটা মেয়ের জন্য সেই সত্যানুসন্ধান কী ভয়ানক কষ্টের এক অভিজ্ঞতা ছিল, সেটা কি কেউ কল্পনা করতে পারবে?)

দুই.

আমি জানি, দেশের কথা বলার সময় অনেকেই নানাভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আমি কখনোই সেটা করি না। অস্বীকার করি না যে, এ দেশের ওপর দিয়ে যত দুঃখ-কষ্ট গেছে, ঝড়-ঝাপটা গেছে, আপদ-বিপদ গেছে, সে রকম আর কোথাও যায়নি। যদিও পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ হয়েছিল, তার পরও ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশকেই দ্বিতীয় পাকিস্তান বানানোর জন্য ছলবল আর কৌশল কম করা হয়নি। নেতৃত্বের অভাবে কিংবা ভুল নেতৃত্বের কারণে এ দেশ দীর্ঘদিন কানাগলিতে ঘুরপাক খেয়েছে, কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তখন আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর তাজউদ্দীন আহমদের মতো নেতা পেয়েছিলাম। সৃষ্টিকর্তার নিশ্চয়ই এ দেশের মানুষের জন্য একটু মায়া আছে, তা না হলে কেমন করে আমরা সঠিক সময়ে সঠিক দুজনকে পেয়েছিলাম? বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন; কিন্তু যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়, তখন তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। সেই সময় স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। যদি তখন তিনি সঠিক নেতৃত্ব না দিতেন, তাহলে কী হতো—চিন্তা করে এত দিন পরও আমার বুক কেঁপে ওঠে। কিছুদিন আগে আমরা সমমনা কিছু মানুষ মিলে *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* নামে খুব ছোট একটা বই প্রকাশ করেছি, সবার অনুরোধে সেটা লিখেছি আমি। সেখানে এক জায়গায় লেখা আছে, 'এপ্রিলের ১০ তারিখ মুজিবনগর থেকে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয়।' কত সহজেই এই লাইনটি লেখা হয়েছে, কিন্তু সেই সময় সেটা যে কত জটিল একটা বিষয় ছিল, এত দিন পর কি কেউ তা কল্পনা করতে

পারবে? সেটা সম্ভব হয়েছিল শুধু তাজউদ্দীন আহমদের মতো দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা আর সংগঠকের জন্য।

তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল রূপকথার মতো আশ্চর্য। ২৫ মার্চের রাতে যখন গণহত্যা শুরু হয়, তখন তিনি খুব দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—পরিবারের আগে তাঁকে দেশের দায়িত্ব নিতে হবে। তাই ২৭ মার্চ তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লিখে চলে গেলেন। চিঠির ভাষা ছিল এ রকম: 'আমি চলে গেলাম। যাবার সময় বলে আসতে পারিনি। মাফ করে দিও। তুমি ছেলেমেয়ে নিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে মিশে যেও। কবে দেখা হবে জানি না...মুক্তির পর।' ৩০ মার্চ তিনি সীমান্ত অতিক্রম করলেন এবং সীমান্ত অতিক্রম করার আগে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী একটা দেশের প্রতিনিধির প্রাপ্য মর্যাদাটুকু তিনি নিশ্চিত করে নিলেন। নিজের দেশের মাটিতে ফিরে আসার আগে সব সময় তিনি এভাবে তাঁর মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তিনি প্রথমেই খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন, এটা আমাদের যুদ্ধ। এই স্বাধীনতাসংগ্রাম একান্তভাবেই আমাদের এবং আমরাই এই যুদ্ধ করব। তারপর তাজউদ্দীন আহমদ কিছু সুনির্দিষ্ট সাহায্য চেয়েছিলেন—শরণার্থীদের আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের কিছু সুযোগ-সুবিধা, কিছু অস্ত্রের সরবরাহ, বাইরের পৃথিবীতে স্বাধীনতার কথা প্রচারের জন্য সহায়তা, পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা। কিন্তু একটিবারও দেশকে স্বাধীন করে দেওয়ার কথা বলেননি—সেটা রেখেছিলেন নিজের দেশের মানুষের জন্য।

প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সব সময়ই নিজের দেশের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। যখনই বিদেশ থেকে কোনো সাংবাদিক বা কোনো কূটনীতিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে কোনো মুক্তাঞ্চলে। ব্যাপারটা ছিল খুব ঝুঁকিপূর্ণ; কখনো কখনো সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত, তার পরও তিনি দেশের মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানের জন্য এই কষ্টটুকু করে গেছেন।

প্রবাসী সরকারের দায়িত্ব পালন করার সময় তাঁর যে ভূমিকাটি ছিল, সেটা এখন আমাদের সবার কাছে কিংবদন্তির মতো। প্রথমেই সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যত দিন দেশ শত্রুমুক্ত না হবে, তাঁরা কেউ পরিবারের সঙ্গে থাকবেন না। তাজউদ্দীন আহমদ সেটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলেন। যুদ্ধের নয় মাস তিনি কখনো তাঁর পরিবারের কাছে যাননি। অফিসের পাশে একটা ঘরে তিনি ঘুমাতেন।

এপ্রিল মাসের ভেতরেই বাংলাদেশ থেকে তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন, তাঁরা থাকতেন মাত্র তিন-চার মাইল দূরে। ইচ্ছা করলেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাননি। এমনকি একবার

সেই বিল্ডিংয়ে গিয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর পরিবারের কারও সঙ্গে দেখা করেননি। তিনি এসেছেন খবর পেয়ে স্ত্রী-ছেলেমেয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাজউদ্দীন আহমদ তাদের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে লিফটের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন! এর পরেরবার যখন সেই বিল্ডিংয়ে গিয়েছিলেন, তখন গিয়েছিলেন আরও গোপনে, যেন তাঁর পরিবারের লোকজন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মনকে দুর্বল করে দিতে না পারে। তাজউদ্দীন আহমদ জানতেন, খুব বড় কিছু পেতে হলে খুব বড় আত্মত্যাগ করতে হয়। তিনি অনায়াসে সেই আত্মত্যাগ করেছিলেন।

আমাদের নতুন প্রজন্ম কতটুকু জানে আমি জানি না, কিন্তু তাঁর সেই আত্মত্যাগের কথা এখনো আমাদের মধ্যে একধরনের উদ্দীপনার জন্ম দেয়। সারা দিন তিনি মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমাতেন—এ রকম একটা জনশ্রুতি চালু আছে। একজন মানুষ দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমিয়ে বেঁচে থাকতে পারে কি না, আমার জানা নেই। যাঁরা তাঁর খুব কাছের মানুষ, তাঁদের কাছে শুনেছি, তিনি কাজের চাপে আক্ষরিক অর্থে নাওয়া-খাওয়া, ঘুমের সময় পেতেন না। ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ বা বিলাসের তাঁর কোনো সময় বা প্রয়োজন ছিল না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, শুরুতে তাঁর মাত্র একপ্রস্থ কাপড় ছিল। একজন প্রধানমন্ত্রীর মাত্র একপ্রস্থ কাপড় থাকবে, সেটা কেমন দেখায়! তাই তাঁর পরিচিত একজন তাঁকে আরও একপ্রস্থ কাপড় কিনে দিয়েছিলেন। তিনি সেই কাপড় পরে থাকতেন। নিজের কাপড় নিজে ধুয়ে দিয়েছেন! কাপড় ধুতে ধুতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করে ফেলতেন, দাপ্তরিক কাজকর্ম শেষ করতেন। অফিসের পাশে যে ঘরটিতে তিনি থাকতেন, সেখানে ছিল একটা চৌকি, মাদুর, কাঁথা-বালিশ, চাদর আর সাড়ে তিন টাকা দামের একটা মশারি। যুদ্ধের সেই নয় মাস তাঁর ছিল শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। দাপ্তরিক কাজের পাশাপাসঙ্গে সঙ্গে তিনি রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস দিয়েছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বিদেশি সাংবাদিক, কূটনীতিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছেন।

তিন.

তাজউদ্দীন আহমদের জন্ম ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই, যার অর্থ ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪৫ বছর। আমি মাঝেমধ্যে আমার নিজের সঙ্গে তুলনা করি—আমার বয়স যখন ৪৫ বছর, তখন আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান—আমার ওপর কয়েক শ ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই আমি হিমশিম খেয়ে গেছি, অথচ সেই বয়সে তিনি সাড়ে সাত কোটি

মানুষের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার মতো দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমরা এখন জানি, সেই যুদ্ধটা চলেছে মাত্র নয় মাস। কিন্তু তখন কেউ সেটা জানত না, তখন যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সেই অনিশ্চিত জগতে পা দিয়েছিলেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের পুরো জীবনটাই সেখানে উৎসর্গ করেছিলেন।

যুদ্ধের নয় মাস তাজউদ্দীন আহমদকে রণক্ষেত্রের শত্রুর পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভিন্ন একধরনের শত্রুকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, সেই শত্রু ছিল তাঁর দলের ভেতর। সে রকম একজন মানুষ ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ—তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে খোন্দকার মোশতাক আহমদ কিন্তু পুরো মুক্তিযুদ্ধের গতিধারাই পাল্টে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, খোন্দকার মোশতাক আহমদ সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করে জাতিসংঘের একটা অধিবেশনে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতিই পাল্টে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এ খবরটুকু জানার পর শেষ মুহূর্তে তাঁকে সরিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে জাতিসংঘের সেই অধিবেশনে পাঠানো হয়েছিল।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ সে জন্য কখনো তাজউদ্দীন আহমদ আর তাঁর সহকর্মীদের ক্ষমা করেননি, প্রতিশোধ নিয়েছিলেন পঁচাত্তরের নভেম্বরে ঠান্ডা মাথায় জেলখানায় তাঁদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে।

সেদিন আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সরকারের মন্ত্রিপরিষদের ছবি রয়েছে সেখানে। সেখান থেকে খামচে খামচে কেউ একজন খোন্দকার মোশতাক আহমদের ছবিটা তুলে ফেলেছে। কিন্তু জাদুঘরে খামচে খামচে ছবি তুলে ফেলাটাই কি এই মানুষের যোগ্য শাস্তি? বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এই বিশ্বাসঘাতককে কি এ দেশের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে আমরা ঠিকভাবে নিক্ষেপ করেছি? যে তীব্র ঘৃণা নিয়ে আমরা মীর জাফরের নাম উচ্চারণ করি, তার চেয়েও বেশি ঘৃণা নিয়ে কি এই মানুষটার নাম উচ্চারণ করার কথা নয়?

চার.

একাত্তরের ২৩ নভেম্বর তাজউদ্দীন আহমদ রেডিওতে একটা ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, বাংলাদেশের মাটিতে মুক্তিযোদ্ধারা এখন যেকোনো জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনীকে আঘাত করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পরাজিত হওয়ার গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা এখন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সংকট তৈরি করার চেষ্টা করবে।

দুই সপ্তাহের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়; সত্যি সত্যি পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করে বসে। যুদ্ধের কারণে ভারতের সেনাবাহিনীর যদি বাংলাদেশে প্রবেশ করতে হয়, সেটাও যেন সঠিকভাবে করা হয়, তাজউদ্দীন আহমদ তা নিশ্চিত করেছিলেন। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে দুই দেশের যৌথ সামরিক কমান্ড তৈরি করে তারপর তারা বাংলাদেশের মাটিতে প্রবেশ করেছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রিয় দেশটির মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি।

বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় ১৬ ডিসেম্বর, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে আসেন ১০ জানুয়ারি। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ তার যাত্রা শুরু করে, সেই মন্ত্রিপরিষদে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন প্রথম অর্থমন্ত্রী। বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজে লেগে গেলেন অনেক উৎসাহ নিয়ে। তিনি কল্পনা করেছিলেন এমন একটি বাংলাদেশের, যেটি মোটেও পরনির্ভর হবে না, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবে আত্মমর্যাদা নিয়ে। দেশের মর্যাদা তাঁর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সে ব্যাপারে কাউকে তোয়াক্কা করতেন না। মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, সেটা তিনি কখনো ভুলতে পারতেন না। তাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রধান হয়ে রবার্ট ম্যাকনামারা যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁকে তিনি বিমানবন্দরে প্রটোকল দিতে পর্যন্ত রাজি হননি। সপ্তাহ দুয়েক আগে রবার্ট ম্যাকনামারা মারা গেছেন। পৃথিবীর মানুষের নতুন করে তাঁর কথা মনে পড়েছে। কারণ, তিনি ছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের 'স্থপতি'। মিথ্যে তথ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ইরাকে যুদ্ধ করতে গেছে, ঠিক সে রকম মিথ্যে তথ্য দিয়ে তারা ভিয়েতনাম যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েছিল এবং এই রবার্ট ম্যাকনামারা ছিলেন সেই কুটিল ষড়যন্ত্রকারী। বলা যেতে পারে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে অসংখ্য তরুণ মারা গিয়েছিল, তাদের রক্তের দাগ এই রবার্ট ম্যাকনামারার হাতে রয়ে গেছে। পৃথিবীর কোনো কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর বিচার করা যায়নি, সেটা পৃথিবীর অনেক বিবেকবান মানুষকে এখনো পীড়া দেয়। আমাদের সান্ত্বনা, সদ্য স্বাধীন হওয়া ছোট্ট একটি দেশের অর্থমন্ত্রী হয়েও তাজউদ্দীন আহমদ রবার্ট ম্যাকনামারার মতো মানুষকে তাঁর প্রাপ্যটুকু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ম্যাকনামারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বাংলাদেশের কোথায় কোন ধরনের সাহায্য দরকার?'

সেই আলোচনায় আমরা উপস্থিত ছিলাম না, তাই ঠিক কীভাবে কথাগুলো বলেছিলেন আমরা জানি না, তবে অনুমান করতে পারি, ম্যাকনামারার প্রশ্ন শুনে তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'আমাদের যেটা দরকার, আপনারা সেটা আমাদের দিতে পারবেন না।'

ম্যাকনামারা অবাক হয়ে বললেন, 'কেন?'

তাজউদ্দীন আহমদ সরল মুখে বললেন, 'আমার দরকার গরু!'

ম্যাকনামারা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'গরু?'

তাজউদ্দীন আহমদ বললেন, 'হ্যাঁ। কৃষকদের চাষ করার জন্য লাগে গরু। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা গরু খেয়ে ফেলেছে। ভয়ের চোটে পালিয়েও গেছে অনেক গরু। এখন চাষ করার জন্য গরু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ম্যাকনামারা অবাক হয়ে তাজউদ্দীন আহমদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন তাজউদ্দীন আহমদ বললেন, 'ও, হ্যাঁ। আমাদের আরও একটা জিনিস দরকার।'

ম্যাকনামারা একটু আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'গরুগুলো বেঁধে রাখার জন্য দড়ি।'

ম্যাকনামারা নির্বোধ মানুষ ছিলেন না, তাই তাজউদ্দীন আহমদের টিটকারিটুকু বুঝতে দেরি হলো না তাঁর। তিনি চুপ করে গেলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দেশের এককালের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের প্রধানের সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলতে পারেন, সেটা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেননি!

পাঁচ.

পরের ইতিহাসটুকু আসলে একটুখানি দুঃখের ইতিহাস। ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের ভেতর একটা দূরত্বের সৃষ্টি হলো। তাজউদ্দীন আহমদের ভেতর খুব সংগত কারণে খানিকটা অভিমান ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস তিনি অবিশ্বাস্য এক কঠিন সময়ের ভেতরে থেকেও আশ্চর্য দক্ষতায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কখনো সেই ইতিহাসটুকু তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে শুনতে চাননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা তাজউদ্দীন আহমদের বিরোধিতা করেছিল, তারাই আবার ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। দেশের স্বার্থ ছাপিয়ে দলাদলি অগ্রাধিকার পেতে শুরু করল। তাজউদ্দীন আহমদ বাকশাল তৈরি করে একদলীয় শাসন শুরু করার ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি একদিন বঙ্গবন্ধুকে ইংরেজিতে বলেছিলেন, 'বাই টেকিং দিস স্টেপ ইউ আর ক্লোজিং অল দ্য ডোরস টু রিমুভ ইউ পিসফুলি ফ্রম ইওর পজিশন।' (এই পদক্ষেপ নিয়ে আপনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপনাকে সরানোর সব পথ বন্ধ করে দিলেন!)

তাজউদ্দীন আহমদের সেই কথাগুলো ছিল প্রায় দৈববাণীর মতো। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পৃথিবীর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। হত্যাকারী সেনা অফিসাররা রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেছে নিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদকে। খোন্দকার মোশতাক আহমদ আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে তাঁর সরকারের একটা বৈধ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কেউ এগিয়ে এল

না। খুব দ্রুত বুঝতে পারলেন তাঁর পায়ের নিচে মাটি নেই। ক্যু, পাল্টা ক্যু হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের নেতারা যেন আবার ক্ষমতায় চলে আসতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে জেলখানায় গিয়ে হত্যা করা হয় চার নেতাকে। বাংলাদেশকে ঠেলে দেওয়া হয় একটা অন্ধকার গহ্বরে।

বহুদিন পর আমরা সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছি।

ছয়.

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সময়ের পার্থক্য ছিল ৩০ মিনিট। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ভারতের মাটিতে থেকে কাজ করত, চলত ভারতের সময়ে। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ কোনো দিন তাঁর হাতঘড়ির সময় পরিবর্তন করেননি, সেটা চলত বাংলাদেশের সময়ে।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানি দানবেরা এ দেশের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। তখন আকাশে শকুন উড়ত, নদীর পানিতে ভেসে বেড়াত ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ, শুকনো মাটিতে দাউদাউ করে জ্বলত আগুনের লেলিহান শিখা, বাতাস ভারী হয়ে থাকত স্বজনহারা মানুষের কান্নায়। শুধু বাংলাদেশের সময়টুকু তারা কেড়ে নিতে পারেনি। তাজউদ্দীন আহমদ পরম মমতায় সেই সময়টুকুকে তাঁর হাতঘড়িতে ধরে রেখেছিলেন।

ঘাতকের বুলেট তাজউদ্দীন আহমদের হৃৎস্পন্দন চিরদিনের জন্য থামিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর হাতের ঘড়িতে ধরে রাখা বাংলাদেশের সময়টাকে কোনো দিন থামাতে পারবে না।

যত দিন বাংলাদেশ থাকবে, তত দিন তাজউদ্দীন আহমদের ঘড়ি আমাদের হৃদয়ে টিকটিক করে চলতে থাকবে। চলতেই থাকবে।

প্রথম আলো : ২৩ জুলাই ২০০৯

ঢাকা নামের শহর

মোবারক আলী অফিসে ঢুকেই টের পেলেন কিছু একটা ঘটেছে, কারণ সবাই মাথা ঘুরিয়ে চোখ বড় বড় করে তাঁর দিকে তাকাল। মোবারক আলী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' একজন নিচু গলায় বলল, 'বড় সাহেবের কাছে যান। আপনার খুব বড় বিপদ!'

মোবারক আলী ফ্যাকাসে মুখে বড় সাহেবের অফিসে ঢুকলেন, বড় সাহেব তাঁকে দেখেই চেয়ারে হেলান দিয়ে তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। মোবারক আলী ঢোক গিলে বললেন, 'স্যার, আমার নাকি খুব বড় বিপদ? কেন বিপদ, স্যার? আমি কী করেছি?'

বড় সাহেব হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'গত সপ্তাহে হেড অফিস থেকে জিএম এসেছিলেন, আমি আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম স্যারকে দেখেশুনে রাখতে।'

'আমি দেখেশুনে রেখেছি, স্যার। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম।'

বড় সাহেব লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'স্যার কই মাছ খেতে চেয়েছিলেন, আপনি তেলাপিয়া মাছ খাইয়েছেন। আপনার এত বড় সাহস!'

মোবারক আলী ভাঙা গলায় বললেন, 'আমি সারা বাজার তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, স্যার। কই মাছ পাই নাই, স্যার।'

বড় সাহেব কঠিন মুখে বললেন, 'এখন এসব বলে লাভ নেই। হেড অফিস থেকে ফ্যাক্স এসেছে, আপনার চাকরি নট করে দিতে হবে।'

মোবারক আলী হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন; বললেন, 'আমাকে বাঁচান, স্যার। ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার—এই বয়সে চাকরি চলে গেলে আর চাকরি পাব না, স্যার। না খেয়ে মারা যাব, স্যার!'

বড় সাহেব বললেন, 'এই কথাটা আগে মনে ছিল না?'

মোবারক আলী হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

বড় সাহেব মানুষটা ভালো, তিনি অনেক কষ্ট করে মোবারক আলীর চাকরিটা রক্ষা করতে পারলেন, কিন্তু হেড অফিস থেকে একটা কঠিন শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো, মোবারক আলীকে একটা কঠিন শাস্তি দিতে হবে। এ রকম একটা শাস্তি, যেটা তিনি নিজে আজীবন মনে রাখবেন এবং অফিসের অন্য সবাই সেটা দেখে সারা জীবনের জন্য সতর্ক হয়ে যাবে।

সেই শাস্তি হিসেবে মোবারক আলীকে ঢাকায় বদলি করে দেওয়া হলো। চিঠিটা হাতে পেয়ে তিনি টেবিলে মাথা ঠুকে হাহাকার করে বললেন, 'এর থেকে তো চাকরি চলে যাওয়াই ভালো ছিল।' মোবারক আলীর সহকর্মীরা মুখ কালো করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবেন, কেউ বুঝতে পারছিলেন না।

দুই.

মোবারক আলীকে বিদায় দিতে সবাই বাসস্টেশনে এসেছে। কেউ কোনো কথা না বলে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মোবারক আলীর স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মোবারক আলীর ছেলেমেয়ে দুজন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না, তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মোবারক আলী তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে নরম গলায় বললেন, 'যদি আর দেখা না হয়, মাফ করে দিয়ো।'

তাঁর স্ত্রী আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, এবার হাউমাউ করে কেঁদে স্বামীর বুকে মাথা ঠুকে বললেন, 'কী অন্যায় করেছিলাম গো যে খোদা আমাদের এত বড় শাস্তি দিলেন?'

এ রকম সময় বাসের হর্ন শোনা গেল, বাস ছেড়ে দেবে। উপস্থিত মানুষজন মোবারক আলীর স্ত্রীকে টেনে সরিয়ে নিল, মোবারক আলী দৌড়ে কোনোমতে বাসে উঠলেন। বাসের জানালা দিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন, তাঁর স্ত্রী বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসের পেছনে পেছনে ছুটে আসতে চেষ্টা করছিলেন, সবাই তাঁকে কোনোমতে ধরে রেখেছে। ভয় পেয়ে তাঁর ছেলেমেয়ে দুজনও কাঁদতে শুরু করেছে। যতক্ষণ দেখা গেল, মোবারক আলী বাস থেকে মাথা বের করে তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিন.

বাস যখন ঢাকা পৌঁছেছে, তখন সকাল আটটা। মোবারক আলী একধরনের বিস্ময় নিয়ে ঢাকা শহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কতবার কতভাবে তিনি এই

শহরের নাম শুনেছেন, এই প্রথমবার নিজের চোখে দেখছেন। যত দূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, সেই পানির ভেতর গাড়ি—বাস, ট্রাক, রিকশা যাচ্ছে। সেই পানির ভেতর ছপছপ করে হেঁটে হেঁটে মানুষজন অফিসে যাচ্ছে। ছোট বাচ্চারা বুক সমান পানিতে হেঁটে হেঁটে গল্প করতে করতে স্কুলে যাচ্ছে। কী অপূর্ব এক দৃশ্য!

বাস থেকে একজন একজন করে পানিতে নেমে পড়ছে। মোবারক আলীও নামলেন, তাঁর উরু পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেল। তিনি পাশের মানুষটাকে দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, এখানে এত পানি কেন?'

মানুষটা তাঁর প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারল না; জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কী থাকবে? সয়াবিন তেল?'

'না, না, সেটা বলছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি, একটা শহর তো শুকনো থাকার কথা। চারদিকে পানি কেন?'

'ও আচ্ছা! সেই কথা জিজ্ঞেস করছেন? কোনো জায়গা যদি শুকনো রাখতে চান, তাহলে সেখান থেকে পানি সরানোর জন্য নর্দমা থাকতে হয়, খাল থাকতে হয়। ঢাকা শহরে পানি সরে যাওয়ার জন্য কোনো খাল নাই।'

'কেন নাই?'

মানুষটা একটু খাপ্পা হয়ে বলল, 'সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি ঢাকা শহর ডিজাইন করি নাই। একসময় হয়তো ছিল, এখন সব বুজে গেছে।'

মোবারক আলী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু করপোরেশন? মেয়র? মন্ত্রী? তাঁরা কিছু করেন না?'

মানুষটা এবার ভালো করে মোবারক আলীর দিকে তাকাল; বলল, 'আপনি নতুন এসেছেন, তাই না?'

'জি।'

'সেই জন্যই এ রকম অদ্ভুত কথা বলছেন। আজকে মেয়র সাহেবকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হবে। ঢাকা শহরের সব ইঁদুর মেরে ফেলেছেন, সেই জন্য তাঁর পার্টি থেকে তাঁকে এক কেজি ওজনের সোনার ইঁদুর উপহার দেওয়া হবে।'

'কীভাবে সব ইঁদুর মারলেন?'

মানুষটা চারদিকের থইথই পানি দেখিয়ে বলল, 'এই পানি দিয়ে। সব ইঁদুর নাকি এই পানিতে ডুবে মরে গেছে।'

তার কথাটা সত্য প্রমাণ করার জন্যই ঠিক তখন একটা মরা ইঁদুর ভাসতে ভাসতে এল। মোবারক আলী একটু সরে গেলেন, সরে না গেলেই ভালো হতো, কারণ যেখানে সরে গেলেন, সেখান দিয়ে একটা মরা কুকুর ভেসে যাচ্ছিল। ইঁদুর মারার জন্য মেয়র সাহেবকে যদি সোনার ইঁদুর দিয়ে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়,

তাহলে বেওয়ারিশ কুকুর মারার জন্য মন্ত্রী সাহেবকে সোনার কুকুর দিয়ে গণসংবর্ধনা কেন দেওয়া হবে না—কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও মোবারক আলী থেমে গেলেন। ঢাকা শহরের চালাক-চতুর মানুষ তাঁর বোকার মতো কথা শুনে ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে।

মোবারক আলীর দূরসম্পর্কের ভাই ঢাকা থাকেন, তিনি তাঁর ঠিকানা নিয়ে এসেছেন, প্রথমে তাঁর বাসায় উঠবেন। সেখানে কেমন করে যেতে হবে, তাঁর ভাই বলে দিয়েছেন, তার পরও একটু খোঁজখবর নিয়ে তিনি পানি ভেঙে ছপছপ করে রওনা দিলেন। দুই পাশে উঁচু দালান, মাঝখানে রাস্তা। সেই রাস্তায় পানি ছিটিয়ে গাড়ি চলছে, পাশে মানুষজন হাঁটছে।

মোবারক আলী বেশি দূর যাননি, হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তিনি যেখানে পা দিয়েছেন সেখানে কিছু নেই এবং কিছু বোঝার আগেই তিনি পানিতে তলিয়ে গেলেন। ছেলেবেলায় সাঁতার শিখেছিলেন, তাই তিনি ডুবে গেলেন না, হাত-পা নেড়ে আবার উপরে ভেসে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, ওপরে মাথা আটকে যাচ্ছে। তিনি একটা বাক্সের মতো জায়গায় আটকা পড়েছেন, বের হওয়ার কোনো উপায় নেই, চারপাশে কুচকুচে কালো পানি, কিছু দেখা যায় না, শুধু এক জায়গা থেকে অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে তিনি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলেন, তার পরও মাথা ঠান্ডা রেখে সেই অস্পষ্ট আলোর দিকে সাঁতরে একটা গোলাকার গর্ত দিয়ে বের হয়ে ভুস করে ভেসে উঠলেন। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি আবিষ্কার করলেন, তাঁকে ঘিরে একটা ছোট ভিড়। একজন বলল, 'আর ভয় নেই, ভেসে উঠছে।'

মোবারক আলী কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমার কী হয়েছিল? আমি কোথায় পড়েছিলাম?'

একটা ছোট্ট বাচ্চা হি হি করে হেসে বলল, 'আপনি ম্যানহোলে পড়েছিলেন। এইখানে একটা ম্যানহোল আছে।'

মোবারক আলী বললেন, 'ম্যানহোলের ঢাকনা থাকবে না?' তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল; একজন বলল, 'আপনি ঢাকায় নতুন এসেছেন?'

মোবারক আলী মাথা নাড়লেন। মানুষটা বলল, 'সেই জন্য এই রকম বলছেন। ম্যানহোলের ঢাকনা ধোলাইখালে ভালো দামে বিক্রি হয়। সেই জন্য ঢাকায় কোনো ম্যানহোলের ঢাকনা নেই। এখানে সাবধানে হাঁটতে হয়।'

'কিন্তু কেমন করে বুঝব, কোন দিক দিয়ে হাঁটতে হয়।'

'সবাই যেদিক দিয়ে হাঁটে, আপনিও সেদিক দিয়ে হাঁটেন। নতুন রাস্তা আবিষ্কার করতে যাবেন না।'

কাজেই মোবারক আলী অন্য মানুষের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলেন, খুব সতর্কভাবে। পায়ের নিচে শক্ত মাটি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি পা ফেললেন না।

শেষ পর্যন্ত তিনি একটা বাসস্ট্যান্ড পেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে একটা বাস এসে গেল। মোবারক আলী নিশ্চিত হয়ে নিলেন, তিনি যেখানে যেতে চাইছেন বাসটা সেখানেই যাবে। তারপর তিনি বাসে উঠলেন, জানালার কাছে একটা সিট পেয়ে গেলেন। ম্যানহোলের ময়লা পানিতে তার সারা শরীর ভিজে জবজব করছে, সে কারণে তাঁর একটা লাভ হলো—তাঁর পাশের সিটে কেউ বসল না, তিনি একাই পুরো সিটটা পেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসটা ছেড়ে দিল। দেখতে দেখতে পানি পার হয়ে বাসটা শুকনো এলাকায় চলে এল। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি—রিকশা, টেম্পো, বাস, ট্রাক—তার ফাঁকে ফাঁকে মানুষ কিলবিল করছে। বাসের ড্রাইভার এই ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে কীভাবে কীভাবে যেন বাসটাকে ঝড়ের বেগে নিয়ে যেতে থাকে। এত মানুষ, গাড়ি আর রিকশার ভেতর দিয়ে এত জোরে বাস চালানো যেতে পারে, সেটা তিনি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতেন না। বাসের ড্রাইভার নিশ্চয়ই ছোট থাকতে পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল; পাইলট হতে না পেরে হয়েছে বাসের ড্রাইভার, তাই বাসটাকেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মোবারক আলীর মনে হতে লাগল, যেকোনো মুহূর্তে বাসটা বুঝি কোনো মানুষ কিংবা রিকশাকে চাপা দেবে, কোনো গাড়িকে ধাক্কা দেবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, চাপা দিতে দিতে শেষ মুহূর্তে কীভাবে কীভাবে যেন মানুষগুলো সরে যাচ্ছে, গাড়িগুলো থেমে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে রাস্তায় গাড়ির ভিড় বাড়তে থাকে আর বাসটার গতিও কমে আসতে থাকে। মোবারক আলীর বুকে তখন স্বস্তি ফিরে আসে। একসময় আবিষ্কার করলেন, গতি কমতে কমতে বাসটা পুরোপুরি থেমে গেছে এবং সামনে-পেছনে যত দূর তাকানো যায় তত দূর শুধু গাড়ি আর গাড়ি। এতগুলো গাড়ি যখন একসঙ্গে চলতে শুরু করবে, সেটা নিশ্চয়ই একটা চমকপ্রদ ব্যাপার হবে। সেই দৃশ্য দেখার জন্য তিনি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর বাস আর আশপাশের শত শত গাড়ি একটুকুও নড়ল না। মিনিট দশেক পর তিনি একটু অধৈর্য হয়ে সামনের মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়িগুলো নড়ছে না কেন?'

মানুষটা অবাক হয়ে মোবারক আলীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মানে?'

'মানে, গাড়িগুলো সামনে যাবে না?'

'কেমন করে যাবে? দেখছেন না জ্যাম?'

ছোট থাকতে 'ট্রাফিক জ্যাম' বলে একটা শব্দজোড় শুনেছিলেন, জ্যাম বলতে মনে হয় সেইটাই বোঝানো হয়েছে। মোবারক আলী দুর্বল গলায় বললেন, 'কতক্ষণ থাকবে এই জ্যাম?'

'সেটা কেমন করে বলি? তিন-চার, পাঁচ ঘণ্টা।'

মোবারক আলী একটা খাবি খেলেন, 'তিন-চার, পাঁচ ঘণ্টা?'

মানুষটা ভুরু কুঁচকে মোবারক আলীর দিকে তাকাল; বলল, 'এত অবাক হচ্ছেন কেন? আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে কখনো জ্যাম দেখেননি। আপনি যদি ঢাকা শহরের মানুষ হন, তাহলে দিনে ছয় থেকে আট ঘণ্টা জ্যামে কাটাতে হবে, এইটা এখনো জানেন না?'

মানুষটা গজগজ করে সামনের দিকে তাকাল, মোবারক আলী তাকে আর ঘাঁটালেন না। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন—রাস্তার পাশে আকাশ সমান উঁচু দালান। রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রাখা, একটা-দুটা স্তর নয়, কয়েক স্তর। গাড়ির ড্রাইভাররা ফুটপাতের ছোট ছোট চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারতে মারতে চা খাচ্ছে। ফুটপাতে নানা রকম দোকান, সেখানে বেচাকেনা চলছে। রাস্তায় ভিখিরি। বিকলাঙ্গ শিশুকে কোলে নিয়ে মহিলারা ছোটাছুটি করে ভিক্ষা করছে। ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে একজন ট্রাফিক পুলিশ অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কিছু করার নেই।

দেখতে দেখতে রোদ চড়া হয়ে উঠল। মোবারক আলীর পানিতে ভেজা কাপড় শুকিয়ে যায়। তিনি দরদর করে ঘামতে থাকেন। চারপাশের অসংখ্য গাড়ির ইঞ্জিন থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া বের হতে থাকে—মোবারক আলীর চোখ জ্বালা করে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য বাসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য গাড়ির ভেতরের মানুষগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন।

চারপাশে দামি দামি গাড়ি, গাড়িগুলোর কাচ ওঠানো, ভেতর এয়ারকুলারের শীতল বাতাসে মোটা মোটা মানুষ পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। তাদের গালের ভাঁজে ভাঁজে চর্বি, তেলতেলে চেহারা। তাদের পরনে স্যুট, গলায় টাই; তারা মোবাইল ফোনে কথা বলছে। কোনো কোনো গাড়িতে ফরসা ফরসা মহিলা বসে আছে—ঠোঁটে রং, চোখে কালো চশমা। আভিজাত্যের লক্ষণ হিসেবে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে চর্বি। মোবারক আলী রাস্তার ফেরিওয়ালাদের দিকে তাকালেন—তারা ইংরেজি বই, গানের সিডি বিক্রির চেষ্টা করছে। কেউ কিনছে না; তার পরও শুকনো, রোদে পোড়া হতদরিদ্র মানুষগুলো চেষ্টা করে যাচ্ছে। মোবারক আলী বাসের ভেতরে তাকালেন, মানুষগুলোর মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। শীতল নিরাসক্ত মুখে সবাই চুপচাপ বসে আছে, কখন আবার গাড়িগুলো চলতে শুরু করবে, কখন আবার বাসটা নড়বে।

চার.

মোবারক আলী যখন তাঁর ভাইয়ের বাসায় পৌঁছালেন, তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। ঠিকানা মিলিয়ে তিনি যে বাসাটার সামনে দাঁড়ালেন, সেটা ২৪ তলা।

বাসার সামনে কলাপসিবল গেট বন্ধ, মোবারক আলী একটু উঁকিঝুঁকি দেওয়াতে খাকি পোশাক পরা একজন মানুষ এগিয়ে আসে; জিজ্ঞেস করে, 'কী চান?'

মোবারক আলী পকেট থেকে তাঁর দূরসম্পর্কের ভাইয়ের ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করে দিয়ে বললেন, 'এখানে যাব।'

'আপনার কী হয়?'

'ভাই।'

'একটু দাঁড়ান।' বলে সে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পর হাতে একটা চাবির গোছা নিয়ে এসে গেট খুলে দিয়ে বলল, '২০ তলা। ডান দিকের ফ্ল্যাট।'

'কেমন করে যাব? লিফট আছে না?'

'লিফট আছে, কিন্তু কারেন্ট নাই। সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে।'

মোবারক আলী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সিঁড়ি দিয়ে? ২০ তলা?'

খাকি পোশাক পরা মানুষটা মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। মোবারক আলী একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। প্রথম তিন তলা তিনি সহজেই উঠতে পারলেন। চতুর্থ তলা থেকে তিনি হাঁপিয়ে উঠতে লাগলেন। ছয় তলা ওঠার পর তাঁর মনে হলো, তিনি আর উঠতে পারবেন না। তখন তিনি কিছুক্ষণ রেলিং ধরে বিশ্রাম নিলেন। ১০ তলা ওঠার পর তাঁর বুকের মধ্যে চিনচিনে একধরনের ব্যথা শুরু হলো, ব্যথাটা কমানোর জন্য তিনি অনেকক্ষণ সিঁড়ির ওপর বসে মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিলেন। যখন একটু সুস্থ বোধ করলেন, তখন আবার উঠতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর সারা শরীর ঘেমে উঠল, তাঁর বমি বমি ভাব হতে লাগল, চোখের সামনে সবকিছু দুলতে লাগল। একবার মনে হলো তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন, রেলিংটা ধরে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর ধুঁকে ধুঁকে তিনি আবার উঠতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন ২০ তলায় উঠে গেলেন, তখন তাঁর নিজেরই সেটা বিশ্বাস হলো না। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে ঘরের দরজাটা বের করে মোবারক আলী দরজায় ধাক্কা দিলেন।

ঘরের দরজাটা প্রথমে একটু ফাঁক করে একজন উঁকি দিল, তারপর পুরো দরজাটা খুলে গেল। মোবারক আলীর দূরসম্পর্কের ভাই মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'আসো, মোবারক। ভেতরে আসো।'

মোবারক আলী ভেতরে ঢুকলেন। ঘরের ভেতরে দিনের বেলায়ও আবছা অন্ধকার। সাবধানে হেঁটে সোফার মধ্যে ধপ করে বসে পড়ে মুখ হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকেন। ভেতর থেকে ভাবি আর তাঁর দুই ছেলে এসে উঁকি দেয়। এই ভাবি একসময় সুন্দরী ছিলেন, এখন মোটা হয়ে সেই সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে গেছে। ছেলে দুটিও মোটা। এই বয়সের বাচ্চা মোটা হবে কেন! মোবারক আলী

সোফা থেকে ওঠার একটা দুর্বল চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। ভাবি বললেন, 'তোমার নিশ্চয়ই এখনো খাওয়া হয়নি। এসো, কিছু একটা খেয়ে নাও।'

মোবারক আলী টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিজেকে বাতাস করতে করতে বললেন, 'একটু বিশ্রাম নিয়ে গোসলটা করে নিয়ে...'

'গোসল!' ভাই আর ভাবি একসঙ্গে চমকে উঠলেন।

মোবারক আলী অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, গোসল। কেন, কী হয়েছে?'

'গোসল কীভাবে করবে? পানি কোথায় পাবে? কোনো পানি তো নাই।'

'পানি নাই?'

'না। ইলেকট্রিসিটিই থাকে না, পানি উঠবে কীভাবে? আর ইলেকট্রিসিটি থাকলেই কী, পানির লেভেল নিচে নেমে গেছে। ঢাকা শহর এখন মরুভূমি।'

ভাবি বললেন, 'আমি একটা গামছা ভিজিয়ে দিই, শরীরটা মুছে ফেলো।' মোবারক আলী ভিজা গামছা দিয়ে শরীর মুছে খেতে বসলেন। ভাবি প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছিলেন, ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। মোবারক আলী ছোট ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী, খোকা?'

'মেরা নাম আসিফ হায়।'

মোবারক আলী চমকে উঠলেন, 'কী বললে?'

'ম্যায়নে কাহা মেরা নাম আসিফ।'

মোবারক আলী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভাবির দিকে তাকালেন, 'এরা বাংলা জানে না?' উর্দুতে কথা বলছে কেন?

'উর্দু না, হিন্দি। হিন্দি সিরিয়াল দেখে দেখে এই অবস্থা। সব সময় হিন্দি বলে।'

'হিন্দিতে কথা বলে! কী সর্বনাশ! বাংলায় কথা বলতে বলেন না?' ভাবি বলেন, 'বলে আর লাভ কী? টেলিভিশন ছাড়া তো আর কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নেই—সেখানে হিন্দি সিরিয়াল দেখে।'

'দেখতে দেবেন না।'

'তাহলে কী করবে?'

'খেলাধুলা করবে।'

'খেলাধুলা!' ভাবি শব্দ করে হাসলেন, 'পুরো ঢাকা শহরে বাচ্চাদের খেলার কোনো মাঠ নেই। ঢাকা শহরের কোনো বাচ্চা খেলে না।'

বড় ছেলেটা বলল, 'আলবাত মে খেলতাহু'। হররোজ ম্যায় কম্পিউটার গেম খেলতাহু।'

মোবারক আলী চোখ বড় বড় করে একবার মোটাসোটা দুজন ছেলে, আরেকবার তাদের মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাঁচ.

মোবারক আলী স্কুটারওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে যাবে কি না। স্কুটারওয়ালা তাঁর দিকে ঘুরেও তাকাল না। পর পর চারটা স্কুটারের পর পঞ্চম স্কুটার মোবারক আলীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

মোবারক আলী পকেট থেকে কাগজটা বের করে জায়গাটার নাম বললেন। ভাইকে বলে রেখেছিলেন বাসা ভাড়া পাওয়া যায় এ রকম কয়টা ঠিকানা দিতে, সেই ঠিকানা নিয়ে তিনি বের হয়েছেন। স্কুটারওয়ালা জায়গাটার নাম শুনে সোজা চলে গেল; সে যে যাবে না এ কথাটাও বলা দরকার মনে করল না। মোবারক আলী আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে যখন হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন, তখন একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। একটা কালো ক্যাব তার সামনে এসে দাঁড়াল। ক্যাবের ড্রাইভার মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

মোবারক আলী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, কাগজটা দেখে ঠিকানাটা বললেন। ক্যাবের ড্রাইভার বলল, 'ওঠেন।'

মোবারক আলী পেছনের দরজা খুলে উঠতেই ক্যাবটা ছেড়ে দিল। তিনি সিটে হেলান দিয়ে মাত্র বসেছেন, ঠিক তখন ক্যাবটার গতি কমে এল, আর হঠাৎ করে দুই পাশ থেকে দরজা খুলে দুজন মানুষ ঢুকে তাঁর দুই পাশে বসে পড়ল।

মোবারক আলী চমকে উঠে বললেন, 'আপনারা কারা? আপনারা কেন?'

বাম পাশে বসা মানুষটা ডান হাত উঁচু করে দেখায়। হাতে একটা ধারালো চাকু। সেটা নাড়িয়ে বলল, 'একটা শব্দ করেছ তো তোমার ভুঁড়ি নামিয়ে দেব...!' মানুষটা একটা কুৎসিত গালি দিয়ে বাক্যটা শেষ করল।

ডান পাশে বসা মানুষটা তাঁর শরীর হাতড়ে দেখতে শুরু করেছে। পকেটের মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন নিয়ে শরীর হাতড়াতে থাকে। মোবারক আলী ভয়ংকর আতঙ্কে শক্ত হয়ে বসে থাকেন, তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দ করার ক্ষমতা নেই।

বাঁ পাশে বসা মানুষটা হঠাৎ করে তাঁর চুল ধরে মাথাটা নিচু করে আনে, কিছু বোঝার আগেই তাঁর চোখে কী একটা লাগিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ তীব্র যন্ত্রণায় জ্বালা করে ওঠে। তিনি আর্তনাদ করে উঠছিলেন, কিন্তু বাঁ পাশে বসা মানুষটা তাঁর পেটে চাকুটা দিয়ে খোঁচা মেরে বলল, 'মুখ খুলেছ তো ভুঁড়ি নামিয়ে দেব...।' বাক্যটা সে আবার শেষ করল একটা কুৎসিত গালি দিয়ে। মোবারক আলী মুখ খুললেন না। তিনি টের পেলেন গাড়িটা গতি কমিয়ে একসময় থেমে গেল। বাঁ পাশের দরজা খুলে দুজনের একজন নেমে যায়। ভেতরে যে আছে, সে লাথি মেরে মোবারক আলীকে নিচে ফেলে দিল। মোবারক আলী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন, শুনতে পেলেন গাড়িটা গর্জন করে চলে যাচ্ছে।

মোবারক আলী চোখ খুলতে পারছেন না, তিনি হামাগুড়ি দিয়ে এগোনোর চেষ্টা করলেন। ঢাকা শহরের কোনো একটা অচেনা রাস্তায়।

ছয়.

এটা একটা কাল্পনিক গল্প। কিন্তু যাঁরা ঢাকায় থাকেন তাঁরা সবাই জানেন, এর প্রতিটা ঘটনা সত্যি। ঢাকা শহরে একজনও পাওয়া যাবে না, যাঁর জীবনে এ রকম কোনো ঘটনা নেই। আমাদের চোখের সামনে আমাদের প্রিয় শহরটি বসবাসের অনুপযোগী মৃত শহরে পাল্টে যাচ্ছে।

কেউ কি নেই এই প্রিয় শহরকে বাঁচানোর জন্য? আমাদের প্রিয় দেশের প্রিয় শহর ঢাকাকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসবে না?

প্রথম আলো : ২৮ আগস্ট ২০০৯

শিক্ষানীতির সহজ পাঠ

এবারের শিক্ষানীতি নিয়ে দেশের মানুষের অনেক আগ্রহ। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই কোথাও না কোথাও সেটা নিয়ে সেমিনার বা আলোচনা হচ্ছে, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। এটা খুব চমৎকার একটা ব্যাপার। দেশের মানুষ যদি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে আগে হোক পরে হোক, আমরা চমৎকার একটা শিক্ষাব্যবস্থা পাব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই শিক্ষানীতিটা দাঁড় করানোর জন্য সরকার কিন্তু কোনো কমিশন তৈরি করেনি, সরকার একটা কমিটি তৈরি করেছে—সোজা কথায়, সরকার এই কমিটির সদস্যদের বলেছে তাদের একটু সাহায্য করতে। শুধু তা-ই নয়, সরকার কিন্তু একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে নতুন একটা শিক্ষানীতি তৈরি করতেও বলেনি। সরকার একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে, শিক্ষানীতি ২০০০ কে 'অধিকতর সময়োপযোগী করে পুনর্গঠন' করে দিতে। শুধু তা-ই নয়, সরকার এই কমিটিকে একেবারে সময় বেঁধে দিয়েছিল। কমিটি তাদের প্রথম সভা করেছে ৩ মে, কাজ শেষ করেছে সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ। কেউ কেউ এটাকে একধরনের তাড়াহুড়ো মনে করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুব ভালো একটা পরিকল্পনা। সরকার যদি ডিসেম্বরের ভেতর কাজ চালানোর মতো একটা নীতি দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য হাতে চার-চারটি বছর পেয়ে যাবে, যেটা আগে কখনো কেউ পায়নি। সবচেয়ে বড় কথা, এই শিক্ষানীতি যে আগামী ১০০ বছরের জন্য পাথরে খোদাই করে ফেলা হচ্ছে তা নয়, এখানে পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে যে সময় আর অবস্থা বিবেচনায় এটায় প্রয়োজনীয় রদবদল করা যাবে। এটা হচ্ছে শুরু।

শিক্ষানীতি পুনর্গঠনের যে কমিটি করে দেওয়া হয়েছিল, আমি তার একজন সদস্য ছিলাম। সরকারকে খসড়াটা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা এটা কারও কাছে প্রকাশ করিনি। আমরা সরকারের তৈরি করে দেওয়া একটা কমিটি মাত্র, সরকার চাইলে আমাদের খসড়া নীতিটা নিজের মতো করে কাটছাঁট করে প্রকাশ করতে পারত—আমি ভেতরে ভেতরে সেটা নিয়ে একধরনের দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু সরকার তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পর আমি অত্যন্ত স্বস্তি ও আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম, সরকার আমাদের দেওয়া নীতিমালাটিই একটা দাঁড়ি-কমাও পরিবর্তন না করে হুবহু সেভাবে প্রকাশ করেছে। এখন নানা ধরনের আলোচনা, সমালোচনা, সুপারিশ আসছে; আমরা আশা করব সরকার সেগুলো হাতে নিয়ে খসড়াটা চূড়ান্ত করে নেবে। শিক্ষানীতি কমিটি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, একে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য সরকার কাদের দায়িত্ব দেবে আমরা এখনো সেটা জানি না।

খসড়া শিক্ষানীতি দেশে মোটামুটি একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এটা প্রণয়ন করার আগে আমরা অনেক সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেছি, শিক্ষা নিয়ে আগ্রহী এ দেশের প্রগতিশীল মানুষ কীভাবে চিন্তা করেন আমরা মোটামুটিভাবে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম এবং আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সেভাবে শিক্ষানীতি ২০০০ পুনর্গঠন করেছি। খসড়াটা প্রকাশিত হওয়ার পর সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ এটা গ্রহণ করেছে এবং একে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আরও কী কী বিষয় সংযোজন বা পরিবর্তন করা যায়, তা সুপারিশ করেছে। অন্য ভাগ এটা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদেরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক ভাগ রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে (আমি খবর পেয়েছি মসজিদে মসজিদে এই শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করে ইসলামকে 'রক্ষা' করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।) অন্য ভাগ প্রত্যাখ্যান করেছে এটা যথেষ্ট প্রগতিশীল নয় বলে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার চোখে তাদের সমালোচনাটি চোখে পড়েছে, কিন্তু ঠিক কোথায় কোথায় পরিবর্তন করে শিক্ষানীতিটা মোটামুটিভাবে কাজ চালানোর মতো করে ফেলা যায়, তারা সে ব্যাপারে কোনো বক্তব্য দিচ্ছে না।

শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী বুদ্ধিজীবী, কিংবা রাজনৈতিক কারণে এটার বিরোধিতা করার জন্য কেউ কেউ এটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন, কিন্তু দেশের বেশির ভাগ মানুষ এখনো ঠিক করে জানেন না এর ভেতরে কী আছে। তার কারণ, এই শিক্ষানীতিতে অধ্যায় রয়েছে ২৯টি, সংযোজনী সাতটি। সব মিলিয়ে পৃষ্ঠা ৯৭। অনেক তথ্য ঠেসে দেওয়া হয়েছে বলে রোমান্টিক উপন্যাসের মতো সহজপাঠ্য নয়—যাদের কৌতূহল আছে, শুধু তারাই হয়তো কষ্ট করে পড়বে। ওয়েবসাইটে পিডিএফ করে দেওয়া হলেও ফন্টটি সংযোজন করা হয়নি, কাজেই কম্পিউটারে বাংলা ফন্ট না থাকলে এটা পড়ার উপায় নেই (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

এই বিষয়টা খেয়াল করা উচিত ছিল।) পত্রপত্রিকায় ছাড়া-ছাড়াভাবে এর কিছু কিছু বিষয় লেখা হয়েছে, সেটা পড়ে পুরো শিক্ষানীতি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, দেশের সাধারণ মানুষেরও এটা জানা দরকার। যে মা তাঁর বাচ্চাকে দুই বেলা স্কুলে নিয়ে যান এবং ফিরিয়ে আনেন, যে বাবা তাঁর সন্তানের পড়ার খরচ কোথা থেকে আসবে সেটা নিয়ে দুর্ভাবনা করেন, কিংবা যে কিশোর বা কিশোরী প্রাইভেট আর কোচিংয়ে ছোটাছুটি করে গাইড বই মুখস্থ করতে করতে অবাক হয়ে ভাবে, এ দেশে কি একজন মানুষও নেই যে তাদের কথা ভাবে—তাদের সবারই জানা দরকার শিক্ষানীতিতে কী আছে। আমি তাই খুব সংক্ষেপে শিক্ষানীতির কয়েকটা বিষয় এখানে লিখছি। একবারে যেন পড়ে ফেলা যায় তাই লেখাটা হবে ছোট, এবং যেহেতু লিখছি 'আমি' তাই 'আমার' কাছে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলোই এখানে ওঠে আসবে। এই সীমাবদ্ধতাটুকু যদি কেউ মেনে নিতে রাজি থাকেন, তাহলে পড়তে শুরু করতে পারেন।

দুই.

প্রাথমিক বা প্রাইমারি শিক্ষা দিয়ে শুরু করা যাক। আমরা সবাই দেখেছি, এ দেশের বিত্তশালী মানুষের ছেলেমেয়েরা প্রাইমারি স্কুল শুরু করার আগে প্রি-স্কুলে এক-দুই বছর স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। এই শিক্ষানীতিতে দেশের সব শিশুর জন্য এক বছরের প্রি-স্কুল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে সেটা যেন হয় খুব আনন্দময় পরিবেশে। এ দেশে যত বাবা-মা আছেন, তাঁরা সবাই ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করার জন্য তাঁদের বাচ্চাদের একটা ভয়ংকর ভর্তি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে নিয়ে যান। শিক্ষানীতিতে একটা শিশুকে এ রকম হাজারো তথ্য মুখস্থ করিয়ে বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষায় যাতে সম্মুখীন হতে না হয়, সেজন্য এ পরীক্ষাকে নিষিদ্ধ করতে বলা হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা খুব দুর্বল। পাবলিক পরীক্ষাগুলো হয় ১০ বছর ও ১২ বছরের মাথায়। তাই যেটুকু লেখাপড়া করতে হয় পরীক্ষার ভালো একটা ফলের জন্য, সেটা তখনই করা হয়। প্রাথমিক স্তরের পর যদি একটা পাবলিক পরীক্ষা থাকত, তাহলে স্কুলগুলো সেই পরীক্ষায় ভালো করার জন্য হলেও লেখাপড়ায় মনোযোগী হতো। এখন প্রাইমারি স্কুল থেকে পাস করে বের হওয়া ছাত্র কতটুকু জানে, সেটা সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে পঞ্চম শ্রেণীর পরই একটা পাবলিক পরীক্ষা নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দশম শ্রেণীর পর যে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হয়, সেটা বরং অষ্টম শ্রেণীর পর নিয়ে আসা যেতে পারে। এটা করা হলে আরও একটা অনেক বড় ব্যাপার ঘটে যেতে পারে—

শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সবার জন্য একই মানের', যার অর্থ আমাদের দরিদ্র দেশের দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তানেরা আরও তিন বছর সরকারের খরচে পড়তে পারবে।

আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা করার একটা বাস্তব দিকও রয়েছে। আর্থ-সামাজিক কারণে অনেক ছেলেমেয়েই পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারে না, তাদের যদি জোর করেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে অন্তত সেই পড়ালেখাটা দিয়েও তারা কোনো একটা বৃত্তিমূলক কাজে ঢুকে যেতে পারবে। পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষায় সেটা সম্ভব নয়। এসব কিছু বিবেচনা করে শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করার কথা বলা হয়েছে। হুট করে সেটা করার কোনো পরিকল্পনা নেই; ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে। এর জন্য অনেক অবকাঠামো দাঁড় করাতে হবে, অনেক শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। টাকাগুলো কোথা থেকে আসতে পারে, শিক্ষানীতিতে তারও একটা ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে (৭৯)।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নেওয়া হবে, তার অর্থ এ রকম নয় যে এখন ছেলেমেয়েরা পঞ্চম শ্রেণীতে যেটুকু পড়ে ভবিষ্যতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সময় নিয়ে সেটুকু পড়বে। অষ্টম শ্রেণীতে যা পড়া দরকার, তারা সেটাই পড়বে। আমরা সেটাকে বলব প্রাথমিক স্তর, এটাই হচ্ছে আসল কথা।

এবার প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা বলা যায়। এত দিন সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম আর মাদ্রাসার সবাই নিজের নিজের বিষয় পড়েছে। এই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মৌলিক কিছু বিষয় সবাইকে একইভাবে পড়ত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিষয়গুলো শুরু হবে বাংলা, ইংরেজি আর গণিত দিয়ে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু হবে বাংলাদেশ স্টাডিজ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ (যার ভেতরে বিজ্ঞানের সূচনা করা হবে) এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা। অতীতে ধর্মশিক্ষা দিতে গিয়ে ছোট বাচ্চাদের ঘোরতর সাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, সে রকমটি যেন না ঘটে তাই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, ধর্মশিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে 'শিক্ষার্থীর বাংলাদেশের মূল চারটি ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি'। শুরুতে একটা শিশু যদি অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়, তাহলে সে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে বড় হতে পারবে। এ ছাড়া তৃতীয় থেকে যে নৈতিক ও ধর্মশিক্ষা শুরু হবে, সেটা হবে জীবনী আর গল্পের ভেতর দিয়ে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরও দুটি বিষয় যুক্ত হবে সে দুটি হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি (তার সঙ্গে বিজ্ঞান) এবং একটা কর্মমুখী শিক্ষা।

শিক্ষানীতির ভেতর আসলে এত খুঁটিনাটিতে যাওয়ার কথা নয়, কিন্তু ইচ্ছে করে এটা রাখা হয়েছে যেন সবাই বুঝতে পারে কখন একটা বাচ্চা কী পড়বে।

আমাদের দেশে ১৯৯৫ সালের পর কারিকুলামের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, শিক্ষানীতিতে তাই নতুন শিক্ষাক্রম আর পাঠ্যসূচির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের হাতে যেন আকর্ষণীয় ও সুন্দর বই তুলে দেওয়া যায়, সেটার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সব ছেলেমেয়ে মূল বিষয়গুলো একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে পড়বে, পাঠ্যবইগুলোও হবে এক। আমরা জানি, আমাদের দেশে দুই ধরনের ইংরেজি মাধ্যম চালু আছে—প্রচলিত ইংরেজি মাধ্যমে এসএসসি, অন্যটি ও-লেভেল, এ-লেভেল। এই শিক্ষানীতিতে ইংরেজি মাধ্যমকে রেখে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের ইংরেজি ভাষায় হলেও মূল বিষয়গুলো একই পাঠ্যসূচিতে পড়তে হবে। শিক্ষানীতিতে যখন 'মাদ্রাসা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তখন আলিয়া ও কওমি—দুই মাদ্রাসাকেই বোঝানো হয়েছে। আলিয়া মাদ্রাসা আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ হিসেবে আছে; কওমি মাদ্রাসাকে এর আওতায় আনা হবে সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম বা মাদ্রাসা—প্রতিটি ধারাই মূল বিষয়ের বাইরে নিজেদের প্রয়োজনে বাড়তি বিষয় পড়াতে পারবে।

এবার পরীক্ষার বিষয়টাতে আসা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোনো আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা থাকবে না। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বছরে দুটি অর্ধবার্ষিক আর বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষাটা হবে আঞ্চলিক, আর সেটার ওপর নির্ভর করে ছাত্রছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হবে। আগেই বলা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষাটা হবে পাবলিক পরীক্ষা, সেই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হবে। শিক্ষানীতিতে খুব স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষাগুলো হবে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতিতে।

তিন.

প্রাথমিক শিক্ষার পর স্বাভাবিকভাবেই আসে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারটা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই সেটা ১২ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত করা। ১২ বছর পর গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষাটা হবে। তবে দশম শ্রেণীর পরীক্ষাটা পুরোপুরি স্কুলের একটা বার্ষিক পরীক্ষা হিসেবে রাখা হয়নি, আঞ্চলিক পরীক্ষা হিসেবে খানিকটা গুরুত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে দুই কারণে—প্রথমত, এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে ছাত্রছাত্রীদের দুই বছরের জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে; দ্বিতীয়ত, কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ছাত্রছাত্রীরা দশম শ্রেণী শেষ করে পড়তে শুরু করবে। তাই এর খানিকটা গুরুত্ব আছে। শিক্ষাক্রম বা বিষয় তালিকায় খুব বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। যে রকম বিজ্ঞান পড়ার জন্য উচ্চতর গণিতকে বাধ্যতামূলক করা

হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষার একটা বিষয় না হলে ছাত্রছাত্রীরা পাছে একটা বিষয়কে হেলাফেলা করে, সে জন্য সামাজিক বিজ্ঞানকে (যার ভেতরে থাকবে বাংলাদেশ স্টাডিজ) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তবে আমার মতে, মাধ্যমিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটা এসেছে মাদ্রাসাশিক্ষায়। আগে তারা অনেক বিষয়ে কম পড়েই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের সমান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে; ব্যাপারটা তাদের জন্য মোটেও ভালো হয়নি। খুব সহজে অনেক বেশি মার্কস পেয়ে তারা একধরনের সুবিধা পেয়ে সত্যিই কিন্তু উচ্চশিক্ষার সুযোগের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এই শিক্ষানীতিতে প্রথমবারের মতো তাদেরও অন্যদের সমান মানের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তারা শুধু যে মাধ্যমিক পর্যায়ের অন্যদের সমান লেখাপড়া করবে তা নয়, তারা আসলে একই প্রশ্নপত্রে একই সঙ্গে পরীক্ষা দেবে। শুধু মাদ্রাসার জন্য নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের পরীক্ষা নেবে মাদ্রাসা বোর্ড। কিছু বিষয় শিক্ষা বোর্ড, কিছু বিষয় মাদ্রাসা বোর্ড পরীক্ষা নেবে—সেটা কোনো ধরনের জটিলতা তৈরি করবে কি না, তা নিয়ে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আশ্বস্ত করার জন্য বলা যায়, কম্পিউটারের ডাটাবেসে রাখা তথ্যগুলো যোগ-বিয়োগ করে এর চেয়ে অনেক জটিল বিষয় অনেক সহজে সমাধান করে ফেলা যায়।

শিক্ষানীতিতে বলা আছে, ১২ বছর পরের পাবলিক পরীক্ষাটা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে বৃত্তি দেওয়া হবে। বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে মাত্র কয়েকটা ধাপ থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডিংয়ের একটা অভিন্ন পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়েও সেই পদ্ধতি চালু করা হবে, যেন দেশে একটা পদ্ধতি থাকে।

চার.

এই শিক্ষানীতিতে আমার একটা প্রিয় অংশ হচ্ছে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার বিষয়টুকু। অতীতে সব সময়ই আকারে-ইঙ্গিতে বা সোজাসুজি বলা হয়েছে, দেশের দরিদ্র মানুষ এই ধারায় লেখাপড়া করবে, যদিও এ দেশের জন্য এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারা। সত্যি কথা বলতে কি, এই ধারা থেকে বের হয়ে আসা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা দেশের উন্নয়নে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছেন। এই শিক্ষানীতিতে প্রথমবারের মতো বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এটা হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত জনশক্তি তৈরি করার ধারা, এমনকি ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা নিয়ে একেবারে অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা যেন বিভিন্ন দক্ষতা-মান অর্জন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ধারায় আসার পর তার উচ্চশিক্ষার পথ যেন রুদ্ধ না হয়ে যায়, সেটা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে অন্যান্য মাধ্যমিক শিক্ষার ধারার সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়গুলো নির্বাচন করে দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত হবে ১ :১২, যদিও অন্যান্য ধারায় সেটা ১ :৩০। আমাদের দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে এখন একজন শিক্ষক মাঝেমধ্যে কয়েক শ ছাত্রছাত্রীকে পড়ান (কিংবা পড়ানোর ভান করেন!), তাঁদের কাছে ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর একটা ক্লাসকে নিশ্চয়ই স্বপ্নের মতো মনে হয়। শিক্ষানীতিতে একটু স্বপ্ন দেখতে দোষ কী?

পাঁচ.

এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুব দুরবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নতুন অনেকগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে; তাদের না আছে অবকাঠামো, না আছে জনবল, না আছে সম্মানজনক বাজেট। মজার ব্যাপারে হচ্ছে, আমরা যখনই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হই, তখন একধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করি যে তারা প্রায় সময়ই হাজার হাজার কোটি টাকার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। আমরা কেউই অস্বীকার করি না যে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে দেশের প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুলের লেখাপড়া। কিন্তু শুধু সেগুলোর দিকে নজর দিতে গিয়ে এ দেশের উচ্চশিক্ষার দিকে ঠিক করে নজর দেওয়া হচ্ছে না—দেশের একটা বড় ক্ষতি হচ্ছে। যদি উচ্চশিক্ষার জন্য আলাদা একটা মন্ত্রণালয় থাকত, তাহলে হয়তো উচ্চশিক্ষার ব্যাপারটা আরও বেশি গুরুত্ব পেত। তাই এই শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষার জন্য একটা আলাদা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষায় আমরা লেখাপড়া ও গবেষণা নিয়ে যা আশা করি, তার সবই এই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। যে দুটি বিষয় আলাদা করে বলা যায় তার একটি হচ্ছে, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মিলে কেন্দ্রীয়ভাবে একটা ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া। সারা দেশে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ ইত্যাদি নিয়ে যা ঘটেছে, আমার ধারণা, এর কারণে সবাই নিশ্চয়ই এটা দেখতে চাইবে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় শিক্ষানীতিতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে; সেটা হচ্ছে, চার বছরের স্নাতক ডিগ্রিকে সমাপনী ডিগ্রি হিসেবে বিবেচনা করা। এমনিতেই সেশনজটের

কারণে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি শেষ করতে ছয়-সাত বছর লেগে যায়; তারপর সবাই স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি করতে শুরু করে, যার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতে হতে একজন ছাত্র রীতিমতো মধ্যবয়স্ক হয়ে যায়। শিক্ষানীতিতে বেশ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষায় যারা শিক্ষকতা করবে, তারা ছাড়া অন্য কারও মাস্টার্স করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ছয়.

শিক্ষানীতির সব বিষয় এই ছোট পরিসরের আলোচনার মধ্যে আনা সম্ভব নয়, কিন্তু শিক্ষকদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই শিক্ষানীতিতে যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার কয়েকটা উল্লেখ করা দরকার। এই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদমর্যাদা সচিবের মর্যাদার সমান করে তার সঙ্গে মিল রেখে বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের পদমর্যাদা নির্ধারণ করতে হবে এবং বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান করতে হবে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন তাহলে ৮ ও ১০ নম্বর গ্রেডে, আর যদি প্রশিক্ষণ না নিয়ে থাকেন তাহলে এক ধাপ নিচের গ্রেডে বেতন নির্ধারণ করার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে।

দেশের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের তাঁদের নিজের দায়িত্বের বাইরে অনেক ধরনের কাজ করতে হয় (শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। গ্রামে স্যানিটারি লেট্রিন কতগুলো আছে, মাঝেমধ্যে ক্লাস পড়ানো বন্ধ করে সেগুলোও গুনতে হয়!) এই শিক্ষানীতিতে তাই বেশ স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে, ছুটির সময় ছাড়া অন্য সময়ে তাঁদের এ ধরনের কাজে লাগানো যাবে না।

শিক্ষকদের নির্বাচনের জন্য একটা শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশনের কথা বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষকদের নির্বাচন করে দ্রুত নিয়োগ দেওয়া হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টাও অনেক বিস্তারিতভাবে এই শিক্ষানীতিতে বলা আছে। শিক্ষা প্রশাসনে শিক্ষকেরা থাকেন না বলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নানা ধরনের যন্ত্রণা সহ্য করে। তাই এখানে খুব স্পষ্ট করে বলা আছে, শিক্ষা প্রশাসনে একেবারে সচিব থেকে শুরু করে সব স্তরে যোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে।

সাত.

এই শিক্ষানীতি বা অন্য কোনো শিক্ষানীতিই আসলে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের সবগুলো বিষয় ধারণ করতে পারবে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য

শিক্ষানীতিকে ক্রমাগত পরিমার্জন করতে হবে। এই দায়িত্বগুলো পালন করার পাশাপাশি শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য এই শিক্ষানীতিতে আইনের মাধ্যমে একটা জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে। যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী, প্রশাসক বা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের মতো একটা শক্ত শিক্ষা কমিশন গঠন করে দেওয়া হলে সেই কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বক্ষণ দেখেশুনে রাখতে পারবে।

আট.

শিক্ষানীতিতে যা যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, এতক্ষণ আমি সেগুলো লেখার চেষ্টা করেছি। যাঁরা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ পড়ে এসেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে আমি কিন্তু শিক্ষানীতির দর্শন বা আদর্শ অংশগুলো লিখিনি; লিখেছি অত্যন্ত বাস্তব বিষয়গুলো, যেগুলো সরাসরি আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনকে স্পর্শ করবে। আগেই বলা হয়েছে, আমার এই লেখাটা মোটেও শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়, এটা 'আমার' দৃষ্টিতে দেখা অত্যন্ত খণ্ডিত একটা রূপ। লেখা শেষ করে আমি আবার শিক্ষানীতিটার মধ্যে চোখ বুলিয়ে গেছি, সাধারণ মানুষ যে বিষয়গুলোতে বা যে বাক্যগুলোতে আগ্রহী হতে পারে সেগুলো কাগজে টুকেছি; টোকা শেষ হওয়ার পর গুনে দেখেছি, ৪০টি বিষয় লেখা হয়েছে। এই লেখায় ৪০টি নতুন বিষয়ে বাক্য লেখা সম্ভব নয়, তাই ১৫টি বিষয় সংক্ষেপে লিখি এক লাইনে। আমার ধারণা, যে কেউ বিষয়গুলোকে স্বাগত জানাবেন। বিষয়গুলো এ রকম :

১. শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য হিসেবে, মুনাফা অর্জনের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

২. আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য তাদের ভাষায় যাতে কথা বলতে পারে সে রকম শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে যেন বিকাশ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. লেখাপড়ার বিষয়টি এমনি এমনি ছেড়ে না দিয়ে প্রতিটা শ্রেণী বা বিষয়ে আগে থেকে প্রান্তিক যোগ্যতা ঠিক করে নিয়ে সেই যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে লেখাপড়া করতে হবে। (১২ বছর ইংরেজি পড়ে অনেকে এক লাইন ইংরেজি লিখতে পারে না, এ রকম ব্যাপার যেন না ঘটে।)

৪. প্রাইমারি স্কুলে অনেক বাচ্চা ঝরে পড়ে, তারা স্কুলে আসে ক্ষুধার্ত হয়ে, ফিরে যায় ক্ষুধার্ত থেকে। কাজেই দুপুরে স্কুলে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. পশ্চাৎপদ এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে—যে রকম হাওর এলাকায় বর্ষায় পানি নেমে আসে, সবাই পানিবন্দী হয়ে যায়। তাদের জন্য বা তাদের মতো অন্যদের জন্য আলাদা সময়সূচি করতে হবে।

৬. মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রজনন-স্বাস্থ্যশিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষানীতির নারীশিক্ষা অধ্যায়ে এটা আরও একবার লেখা হয়েছে বলে অনেকের ধারণা হয়েছে, এটা বুঝি শুধু মেয়েদের জন্য বলা হয়েছে। আসলে সবার জন্যই বলা হয়েছে।

৭. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেভাবে গবেষণা হয় না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো আন্ডারগ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম শুরু করে জোরেশোরে গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে।

৮. তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলা হলেই আমরা সবাইকে কম্পিউটার শেখানোর কথা বলি, কিন্তু কম্পিউটার যে আসলে একটা 'টুল' এবং লেখাপড়া শেখানোর জন্য যে কম্পিউটারকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়, সেটা আমরা লক্ষ করি না। শিক্ষানীতিতে সেটা সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৯. আমাদের অনেকের ধারণা, মেয়েরা শুধু মেয়েলি বিষয় পড়বে (যেমন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), শিক্ষানীতি সেটা পুরোপুরি বাতিল করে বলেছে, মেয়েদের লেখাপড়ার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাদের যেটা ইচ্ছে সেটা পড়বে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে না।

১০. এত দিন প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া ছিল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার কথা বলা হয়েছে।

১১. প্রতিটি প্রাইমারি স্কুলে লাইব্রেরি তৈরি করে ছোট বাচ্চাদের হাতে গল্পের বই তুলে দেওয়া হবে।

১২. জেনারেল এরশাদের আমলে বাংলাদেশের স্কুলের 'লাইব্রেরিয়ান' পদটি বাতিল করে দেওয়ায় সারা দেশে কোনো হাইস্কুলে আর কার্যকর লাইব্রেরি নেই। লাইব্রেরিয়ানের পদ সৃষ্টি করে সব হাইস্কুলে আবার নতুন করে লাইব্রেরি কার্যকর করতে হবে।

১৩. এখন বোর্ডের বই লেখার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, কয়েকজন লিখে জমা দেন, একজনেরটা বেছে নেওয়া হয়। তা না করে যাঁরা আসলেই ভালো বই লিখতে পারবেন, তাঁদের খুঁজে বের করে বই লেখার দায়িত্ব দিতে হবে।

১৪. স্কুল কমিটিতে নারী অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে সেগুলো আরও বেশি কার্যকর করতে হবে।

১৫. ২০০৮-০৯ সালে শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের মাত্র ২.২৭ শতাংশ খরচ করা হয়েছে, যদিও 'ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক' অনুযায়ী বাংলাদেশ শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ ব্যয় করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারকে দ্রুত তার অঙ্গীকার পালনের কথা বলা হয়েছে।

পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার আগে থামা উচিত। ধর্মান্ধ মানুষ এর মধ্যেই এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েছে। যাঁরা মনে করেন বাংলাদেশটা ধর্মান্ধ মানুষের নয়—আমাদের, তাঁদের হয়তো মাঠে নামার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁরা যেন নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারগুলো অন্যদের জানাতে দ্বিধা না করেন।

আমাদের পরের প্রজন্মকে যেন আমরা চমৎকার একটা শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে যেতে পারি, সেই দায়িত্ব কিন্তু গুটিকতক মানুষের নয়—এ দেশের সবার।

প্রথম আলো : ২৬ অক্টোবর ২০০৯

ডিজিটাল টাইম এবং ঘোড়ার মৃতদেহ

এ বছর জুন মাসের ১৯ তারিখ বাংলাদেশে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের একটা কাজ করা হবে—এ রকম কানাঘুষা হচ্ছিল। আমার ধারণা ছিল, এত বড় একটা ব্যাপার, সেটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে, দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষজন বলবেন যে এটা নেহাত একধরনের খামখেয়ালিপনা—সোজা কথায় পাগলামি; তখন আর এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হবে না। দেশ যখন রাজা-বাদশাহরা শাসন করতেন, তখন তাঁরা এ রকম খামখেয়ালি করতেন—কথা নেই বার্তা নেই তাঁরা পুরো রাজধানী এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যেতেন। রাজা-বাদশাহদের সেই খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করত না। কার ঘাড়ে দুটি মাথা আছে যে এর প্রতিবাদ করে নিজের গর্দানটি হারাবে? আমি ভেবেছিলাম, এখন তো রাজা-বাদশাহদের আমল নয়—এখন গণতান্ত্রিক সরকার, এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই কিছু খামখেয়ালি মানুষ নিয়ে ফেলবে না।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, দেশের বিদ্যুৎ বাঁচানোর কথা বলে হুট করে একদিন ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হলো! আমি দুর্বলভাবে পত্রিকায় একটা লেখা লিখেছিলাম, কিন্তু কার সময় আছে যে আমাদের মতো মানুষের লেখা পড়ার কিংবা সেই লেখা বিবেচনা করার? আজকে আবার লিখতে বসেছি। আগের বার যখন লিখেছিলাম, তখন নিজের ভেতর যে অনুভূতিটা ছিল সেটা ছিল খানিকটা হতাশার। এখন যখন লিখছি, তখন আমার ভেতরকার অনুভূতিটা রীতিমতো ক্রোধের। আস্ত একটা দেশের মানুষকে প্রতারণা করা হলে যেটুকু ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা, আমি এ মুহূর্তে ঠিক সে রকম

ক্রোধান্বিত। 'ডে লাইট সেভিং'-এর কথা বলে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে, এটা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সময় নির্ধারণের পদ্ধতির বাইরে ঠেলে দিয়ে পাকাপাকিভাবে এক ঘণ্টা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এর চেয়ে বড় প্রতারণা আর কী হতে পারে?

যেসব দেশে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়া হয় এবং পিছিয়ে দেওয়া হয়, আমি সে রকম একটা দেশে প্রায় ১৮ বছর ছিলাম। কাজেই এই ব্যাপারটা কী, আমি সেটা খুব ভালো করে জানি। আমার ধারণা, কেন এ ধরনের বিচিত্র একটা কাজ করা হয় সে ব্যাপারে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষের ধারণা ছিল না। কাজেই হুট করে যখন এটা করা হলো, তখন সবাই নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়েছে। বিদ্যুৎ বাঁচানোর একটা খোঁড়া যুক্তি দিয়ে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছিল, তাই অনেক পত্রপত্রিকাও এর পক্ষে সম্পাদকীয় লিখে ফেলেছিল। আমি আবিষ্কার করেছিলাম, এর বিরুদ্ধে কথা বলার মানুষ বলতে গেলে কেউ ছিল না।

আমার ধারণা ছিল, ব্যাপারটা ঘটার পর দেশে এমন একটা গোলমাল লেগে যাবে যে সরকার সঙ্গে সঙ্গে টের পাবে কাজটা খুব বড় ধরনের বোকামি হয়েছে। (আমার মাঝেমধ্যে জানার ইচ্ছে করে, সরকারটা কে বা কী! এটা কি একটা বিমূর্ত ব্যাপার, যারা অদৃশ্য থেকে দেশের বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে? কিন্তু কে ঘটনাটা ঘটিয়েছে, সেটা কি কেউ জানতে পারবে না?) যা-ই হোক, আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, দেশে কোনো বড় ধরনের গোলমাল হলো না, সবাই ব্যাপারটা বেশ সহজেই মেনে নিল। বলতে দ্বিধা নেই, আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম।

দেশে কেন বড় ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, সেটা বুঝেছি অনেক পরে। আমার পরিচিত একজন হঠাৎ খুব বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছে, রীতিমতো পুলিশের হস্তক্ষেপ করিয়ে তাকে ঝামেলামুক্ত করা হয়েছে। মানুষটি সবিস্তারে যখন আমার কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করছে, তখন তাকে আমি মাঝপথে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাত তখন কয়টা?'

মানুষটি বলল, 'আসল টাইম ১০টা। ডিজিটাল টাইম ১১টা।'

আমি তখন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, এ দেশের অনেক মানুষ ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করেনি। তারা এখনো সেটাকে সরকারের এক ধরনের খামখেয়ালি কাণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে 'আসল টাইমে' তাদের জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, তারা সরকারের হুট করে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেওয়ার ফলে তৈরি হওয়া এই নতুন সময়টার নাম দিয়েছে 'ডিজিটাল টাইম', যদিও ডিজিটাল প্রযুক্তি বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এই সরকার নির্বাচনে জিতে দেশ চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে দেশের কমবয়সী ভোটারদের ভোটে। তারা মেনিফেস্টোর দুটি বিষয়কে খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ

করেছিল—একটা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীর বিচার, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের অঙ্গীকার। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কথাটা খুব সুন্দর দুই শব্দে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে আমরা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর একটা দেশ গড়তে চাইছি। শব্দটি অত্যন্ত ইতিবাচক, শব্দটির মধ্যে একটা স্বপ্ন লুকিয়ে আছে।

'ডিজিটাল টাইম' শব্দটিতে কোনো স্বপ্ন লুকিয়ে নেই, এটা একটা টিটকারি। এটা একটা রসিকতা। সরকারের চমৎকার একটা স্বপ্নকে টিটকারিতে পরিণত করার সুযোগ যাঁরা করে দিয়েছেন, তাঁদের কি জিজ্ঞেস করা যায় যে তাঁরা কার বুদ্ধিতে এটা করেছেন?

দুই.

সরকার যখন প্রথম ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, তখন আমরা সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম যে কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হয়নি। কারণ, যদি কখনো গ্রীষ্মকালে এক ঘণ্টা সময় এগিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে শীতকালে এটা আবার এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হয়। মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্র বা ইউরোপের মতো দেশ সেটা করতে পারে, আমাদের মতো দেশের জন্য সেটা এত সহজ নয়। বছরে দুবার করে এই হাঙ্গামা করার মতো ক্ষমতা আমাদের দেশের নেই। কাজেই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এ রকম ঝামেলার মধ্যে না যাওয়া। সরকার তার পরও ঝামেলাটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। আমরা এটা সহ্য করেছি এবং এত দিন নিঃশ্বাস বন্ধ করে সহ্য করে আছি যে শীতকালে ঘড়ির কাঁটা আবার এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার সময় সরকার বুঝতে পারবে যে কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হয়নি। তারপর ভবিষ্যতে আর এ ঝামেলায় পড়তে চাইবে না।

ঠিক যখন ঘড়ির কাঁটা আবার পিছিয়ে নেওয়ার সময় হলো, তখন হঠাৎ করে একদিন রাতের বেলা আমার টেলিফোন বাজতে থাকে। ফোন ধরতেই শুনতে পেলাম, বিবিসি থেকে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি কি জানেন, সরকার ঠিক করেছে তারা ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে নেবে না?' আমি আকাশ থেকে পড়লাম, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঘড়ির কাঁটা নাড়াচাড়া করার পেছনে তবু এক ধরনের যুক্তি আছে, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নিয়ে আর কোনো দিন সেটা পিছিয়ে না আনাটা স্রেফ একধরনের পাগলামি। তুঘলক খান বা কালিগুলারা এগুলো করত—তাই বলে একটা গণতান্ত্রিক সরকার? তারা কি জানে যে এ ব্যাপারটা হঠাৎ করে ঘোষণা করায় এই শুক্রবারকে শনিবার বলে বিবেচনা করার মতো? কিংবা ২০০৯ সালের পর ২০১০ সাল না এসে ২০১১ সাল আসবে—এ রকম একটা ঘোষণা দেওয়ার মতো? বিবিসির প্রতিবেদক আমাকে বললেন, 'আপনি কি জ্বালানি উপদেষ্টার বক্তব্যটা শুনতে চান?'

আমি শুনতে চাইলাম। তখন তাঁরা আমাকে সেটা শোনালেন। আমাদের জ্বালানি উপদেষ্টা বললেন, ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে না আনার কারণে যেসব সমস্যা হবে, সেই সমস্যার সমাধান করা হবে অফিস-আদালত ও স্কুলের সময়সূচি এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়ে! রসিকতাটা কি কেউ ধরতে পেরেছেন? ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নেওয়া হলো, সেই সমস্যা মেটানোর জন্য অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের সময়সূচিও এক ঘণ্টা পরিবর্তন করা হলো! যদি সময়সূচি পরিবর্তন করেই সমস্যার সমাধান করতে হবে, তাহলে সেই গ্রীষ্মকালে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের সময়সূচি পরিবর্তন করে দেওয়া হলো না কেন? তাহলে তো ঘড়ির কাঁটা পরিবর্তন করতে হতো না। এটা হুবহু হবুচন্দ্র রাজার গল্পের মতো—পা দুটো ঢেকে ফেললেই পায়ে ধুলোমাটি লাগে না। পা ধুলোবালি থেকে রক্ষা করার জন্য সারা পৃথিবী চামড়া দিয়ে ঢাকতে হয় না। ঠিক সে রকম অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের সময়সূচি পরিবর্তন করলেই বিদ্যুতের খরচ কমানো যায়—সারা দেশের সব ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দিতে হয় না।

বিবিসির প্রতিবেদক এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য জানতে চেয়েছিলেন। আমার যত দূর মনে পড়ে, আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় কিছু কথা বলেছিলাম। একাধিকবার 'উন্মাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম। ধারণা করছি, বিবিসির মতো সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান আমার ক্রুদ্ধ চিৎকার কাটছাঁট করে সেটা ভদ্র একটা রূপ দিয়ে প্রচার করেছিল।

তিন.

এতক্ষণ ছিল ভূমিকা, এবার আসল কথায় আসি। পৃথিবীর বড় বড় মনীষী মিলে সারা পৃথিবীর একটা সমন্বয় করেছেন, সেটাকে নানাভাবে ভাগ করেছেন। একটা ভাগের নাম দ্রাঘিমাংশ। পৃথিবীটা গোলাকার; গোলাকার বৃত্তের কেন্দ্রে মোট কোণের পরিমাণ ৩৬০ ডিগ্রি। ৩৬০ ডিগ্রি হচ্ছে চারটি সমকোণ—প্রতিটা সমকোণ হচ্ছে ৯০ ডিগ্রি—কাজেই পৃথিবীর ওপর চারটি সমকোণ দিয়ে চারটি দ্রাঘিমা রেখা চলে গেছে। ০ ডিগ্রির দ্রাঘিমা রেখাটা গেছে গ্রিনিচের ওপর দিয়ে, (সে জন্য আমরা কথায় কথায় বলি গ্রিনিচের সময়!) এর পরের সমকোণটা হচ্ছে ৯০ ডিগ্রি; আমাদের দেশের অনেকেই হয়তো জানেন না, এই ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখাটি ঠিক বাংলাদেশের ওপর দিয়ে চলে গেছে। (আমার একটা জিপিএস আছে, আমি সেটা দিয়ে এই ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা খুঁজে বের করেছি—যতবার আমি সেটা অতিক্রম করি, আমি আনন্দের একটা শব্দ করি। মানিকগঞ্জের চৌরাস্তার মোড় থেকে উত্তর-দক্ষিণে যে রাস্তাটা গেছে, সেটা প্রায় ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা দিয়ে গেছে।)

৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখার একটা খুব বড় গুরুত্ব আছে—সেটা হচ্ছে, গ্রিনিচের সময় থেকে এর পার্থক্য হচ্ছে কাঁটায় কাঁটায় ছয় ঘণ্টা। ভারত, পাকিস্তান বা মিয়ানমার তাদের ঘড়ি একটু এদিক-সেদিক করতে পারে, তাতে পৃথিবীর সৌন্দর্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। কিন্তু যে দেশের ওপর দিয়ে ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখাটা গেছে, সেই দেশ যদি তাদের সময়টা গ্রিনিচের সময় থেকে ঠিক ছয় ঘণ্টা পরে নির্ধারণ না করে, তাহলে তারা যে কাজটা করবে সেটা আমার চোখে একটা অনেক বড় অপরাধ। পৃথিবীর বড় বড় মনীষী মিলে সারা পৃথিবীকে একটা নিয়মনীতির মধ্যে এনেছেন, কয়েকজন খামখেয়ালি মানুষ মিলে আমাদের দেশকে সারা পৃথিবীর নিয়মনীতি থেকে সরিয়ে উদ্ভট একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন, সেটা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না।

যাঁরা এ সিদ্ধান্তগুলো নেন, তাঁদের কাছে আমি হাত জোড় করে অনুরোধ করি, এ দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বড় বড় প্রফেসরকে ডেকে একটিবার তাঁদের সঙ্গে কথা বলে নিন। তাঁদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা যে দেশের ওপর দিয়ে গেছে, গ্রিনিচ সময় থেকে সাত ঘণ্টা পরে সময় নির্ধারণ করার কোনো নৈতিক অধিকার সেই দেশের আছে কি না। আমরা স্কুলের বাচ্চাদের শেখাই ২৪ ঘণ্টা সময়টা কেমন করে সারা পৃথিবীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে; খুব জোর গলায় বলি, প্রতি ৯০ ডিগ্রি হচ্ছে ছয় ঘণ্টা সময়। আমাদের কিছু খামখেয়ালি মানুষের কারণে আমরা আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের এই বিষয়টা আর বলতে পারছি না!

চার.

আমি যে প্রফেসরের সঙ্গে পিএইচডি করেছি, তিনি আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখিয়েছিলেন। তার একটি হচ্ছে, 'যদি কোনো কিছু কাজ করে, তাহলে সেটা ঠিক করার চেষ্টা কোরো না।' অনেকেই হয়তো জেনে থাকবেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়াটি এবার আমরা মোবাইল টেলিফোনের এসএমএস দিয়ে করে ফেলেছি। এটা করার জন্য যে ডেটাবেস তৈরি করা হয়েছিল, সেটা আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন দেখতে পেলাম ঠিক ঠিক কাজ করছে, তারপর আমরা একবারও সেটাতে হাত দিইনি। কেউ কেউ সেটাকে আরেকটু সংস্কার করার প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, আমি সেটা করতে দিইনি। আমি আমার প্রফেসরের আপ্তবাক্য স্মরণ রেখেছি, যেটা কাজ করছে সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করতে হয় না। আমার ধারণা, সে কারণে আমরা একটিবারও কোনো সমস্যায় পড়িনি।

আমার প্রফেসর আমাকে আরেকটা বিষয় শিখিয়েছিলেন; বলেছিলেন, 'তুমি তোমার ঘোড়াকে নিয়ে কেরদানি করতে চাও, করো—আমার কোনো আপত্তি

নেই। কিন্তু সেই কেরদানি করতে গিয়ে যদি তোমার ঘোড়া মারা যায়, তাহলে খবরদার, ঘোড়ার মৃতদেহ নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে না—দ্রুত সেটা মাটিতে পুঁতে ফেলবে।'

ঘড়ির কাঁটা নিয়ে যাঁরা কেরদানি করেছেন, তাঁদের জানতে হবে ঘড়ির কাঁটা নামক এ ঘোড়াটা মারা গেছে। এর মৃতদেহ নিয়ে টানাহেঁচড়া করে কোনো লাভ নেই—এখন এটা মাটিতে পুঁতে ফেলার সময় হয়েছে।

যদি সেটা না করা হয়, তাহলে সেটা পচে-গলে সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে, আর কোনো লাভ হবে না।

প্রথম আলো : ৯ নভেম্বর ২০০৯

যুদ্ধাপরাধীর বিচার

ডিসেম্বর একটা অন্য রকম মাস। ৩৮ বছর পরও আমার মনে হয়, এই বুঝি সেদিনের ঘটনা। বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করার আগেই শুনতে পেয়েছিলাম আলবদর বাহিনীর ঠান্ডামাথায় বুদ্ধিজীবী হত্যার খবর। শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না—আমাদের পরিচিত শিক্ষকদের খুন করেছে আলবদর বাহিনী। খবরের কাগজে যখন বদর বাহিনীর খুনিদের নাম ছাপা হয়েছে, সেখানেও আছে আমার পরিচিত সহপাঠী, জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। ১৪ ডিসেম্বর তারিখটি তাই বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আলাদা করে রাখা আছে, তার দুই দিন পরেই বিজয় দিবস। শোক আর আনন্দ পাশাপাশি, দুই দিন এদিক-ওদিক।

একাত্তর সালে কতজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল ,তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। আমরা অনুমান করে নিই, সংখ্যাটা ৩০ লাখ। যাদের হত্যা করা হয়েছে, যারা যুদ্ধে মারা গেছে, শরণার্থী শিবিরে যারা শোকে মারা গেছে, তাদের সবার সংখ্যা যোগ করলে প্রকৃত সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। আমি জানি, এই প্রজন্মের কাছে সেটা অবিশ্বাস্য মনে হয়; কিন্তু আমরা যারা একাত্তরের ভেতর দিয়ে এসেছি, শুধু তারাই জানি মৃত্যু তখন কী একটা সহজ বিষয় ছিল! নয় মাসে ৩০ লাখ লোক মারা গেলে দৈনিক হাজার দশেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে—সেই হিসাবে একাত্তরের নয় মাসের প্রতিটি দিনই কিন্তু একটি শহীদ দিবস, একটি শোক দিবস। যখন আমরা এ দেশের প্রতিটি বধ্যভূমি চিহ্নিত করে সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করব, তখন সবার কাছে সেটা আরও অনেক স্পষ্ট হবে।

একাত্তর সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এত দক্ষতার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে পেরেছিল, কারণ তারা তাদের পাশে পেয়েছিল এ দেশের কিছু পদলেহী বিশ্বাসঘাতক। রাজাকার-আলবদর নামে তাদের পরিচয়—আর এই শব্দগুলোর চেয়ে ঘৃণিত কোনো শব্দ এ দেশে আর কখনো জন্ম নেবে বলে মনে হয় না। সেই কুখ্যাত বদর বাহিনীর প্রধানের নাম ছিল মতিউর রহমান নিজামী। সেদিন হঠাৎ করে খবরের কাগজে তার একটা বক্তব্য চোখে পড়ল। বক্তব্যটা এ রকম : যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলে এ সরকার আসলে দেশকে ইসলামহীন করার পাঁয়তারা করছে।

মতিউর রহমান নিজামী না হয়ে অন্য যেকোনো মানুষ হলে এ কথাটি পড়ে আমি তার জন্য একধরনের মায়া অনুভব করতাম। কারণ দেশ, পৃথিবী ও সমাজ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা না থাকলেই শুধু একজন মানুষ এ রকম মন্তব্য করতে পারে। ডুবে যাওয়া মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো একটি ঘটনা সাবেক বদর বাহিনীর প্রধান এখনো বিশ্বাস করে 'ইসলাম গেল, ইসলাম গেল' রব তুললেই সব মানুষ বুঝি হাতে নাঙা তলোয়ার নিয়ে তার পেছনে এসে দাঁড়াবে—বিষয়টা আর সে রকম নেই। ১৯৭১ সালের পর প্রায় চার দশক পার হয়ে গেছে, এ সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য সব রকম সরকার আমরা দেখেছি। 'মিলিটারি+তত্ত্বাবধায়ক' এই হাইব্রিড সরকারটা আমাদের দেখা বাকি ছিল। ২০০৭-২০০৮ সালে আমরা সেটাও দেখে ফেলেছি। এই নানা ধরনের সরকারের আমলে নানা ধরনের শাসন পরিচালিত হয়েছে, যার বৈচিত্র্যের কোনো শেষ নেই। দেশের মানুষ তার খুঁটিনাটি সবকিছু ভালো করে বুঝেছে কি না জানি না, কিন্তু অন্তত একটা জিনিস বুঝেছে যে এ দেশের মাটিতে তাদের ধর্ম-কর্ম করতে কোনো সরকার কখনো বাধা দেয়নি। মুসলমান না হয়ে অন্য ধর্মের হলে তাদের ভোগান্তি হয়নি, সেটি সত্যি নয়; কিন্তু কোনো মুসলমান ধর্ম পালন করতে পারেনি, সেই কথা কেউ বলবে না। এ দেশে ইসলাম কখনো ধ্বংস হয়নি।

কাজেই বদর বাহিনীর প্রধান মতিউর রহমান নিজামীর মুখ থেকে যখন উচ্চারিত হয় যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার ছলে দেশকে ইসলামহীন করে দেখা হচ্ছে, তখন সবাই কথাটা ভালো করে বুঝতে চায়। যুদ্ধাপরাধীর বিচার করে ইসলামকে ধ্বংস করা না বলে যদি বলা হতো যে জামায়াতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে অনেক মানুষই হয়তো কথাটা গুরুত্ব দিত। সম্ভবত তাদের দাবি যে, এ দেশে তারা ইসলাম ধর্মের এজেন্সি নিয়েছে এবং এই দলটা ধ্বংস হলে ইসলামও ধ্বংস হয়ে যাবে! কারণ ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধের সবচেয়ে বড় অপরাধীদের মধ্যে রয়েছে এ দলের প্রবীণ নেতারা। বিচারকাজ শুরু হওয়ামাত্র তাদের অতীত ইতিহাস একটা একটা করে

বের হয়ে আসবে। আমাদের দেশে এখন রয়েছে অত্যন্ত ক্ষমতাশীল চৌকস একটা সংবাদমাধ্যম, কাজেই অতীতের সেই নৃশংস ঘটনাগুলো চোখের পলকে এ দেশ ও পৃথিবীর মানুষ নতুন করে জানতে পারবে। কাজেই এটা সত্যি কথা—জামায়াতে ইসলামী নামক দলটা মহাবিপদের মধ্যে আছে, সত্যি সত্যি তাদের ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা আছে।

বিচারের রায় কী হবে আমরা কেউ জানি না, কিন্তু অন্তত একটা জিনিস জানি, বিচারপ্রক্রিয়া চলার সময় এই যুদ্ধাপরাধী ও তাদের রাজনৈতিক দলের জন্য মানুষের ভেতর নতুন করে যে ঘৃণার জন্ম হবে, সেটা হবে বিচারের রায় থেকেও অনেক শক্তিশালী একটা ব্যাপার। একটা রাজনৈতিক দল চালাতে হলে সেখানে নতুন প্রজন্মকে যোগ দিতে হয়। পুরোনো নেতারা অবসর নেওয়ার পর নতুন নেতারা তাদের স্থান দখল করে নিতে থাকে।

সাবেক বদর বাহিনীর দল জামায়াতে ইসলামীতে সেটা কেমন করে ঘটে তা দেখার জন্য আমি অনেক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। যে দলটি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বাংলাদেশকে টুটি চেপে হত্যা করতে চেয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে—সেই দলে এ দেশের নতুন প্রজন্ম আর যোগ দেবে, আমার সেই বিশ্বাস নেই। এ দেশের তরুণসমাজ এত বড় বেইমান নয়।

এ দেশের তরুণ প্রজন্মকে আমি চিনি। অতীতে তাদের ধোঁকা দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের দলে টেনে নেওয়া গেছে, ভবিষ্যতে আর নেওয়া যাবে না।

আধুনিক পৃথিবীতে সব ধরনের দল টিকে থাকতে পারে, কিন্তু যুদ্ধাপরাধীর দল টিকে থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও টিকে নেই।

জনকণ্ঠ : ১৬ ডিসেম্বর ২০০৯

ক্রসফায়ার

বেশ কয়েক বছর আগে আমি একবার গাড়িযোগে পান্থপথ দিয়ে আসছি, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, সামনে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে এবং সে জন্য আমাদের গাড়িও দাঁড়িয়ে গেল। ট্রাফিক জ্যামে গাড়ি আটকে পড়া এ দেশে এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়; কিন্তু তবু আমরা গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করলাম এবং মনে হলো, সামনে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। পথচারীদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সামনে একজন বড় সন্ত্রাসীকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। শুনেই আমি চমকে উঠলাম। এ রকম একটা দৃশ্য আমি দেখতে প্রস্তুত নই। ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে বড় একটা রাস্তায় একজন মানুষকে পিটিয়ে মারা হবে, আর কেউ কিছু করবে না, সেটা কেমন করে হতে পারে? আমি ধরে নিলাম, এক্ষুনি পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামলে নেবে।

টের পেলাম আস্তে আস্তে গাড়িগুলো এগোতে শুরু করেছে এবং তখন আমাদের গাড়িও এগোতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ঘটনাস্থলে চলে এলাম। দেখতে পেলাম, দুই রাস্তার মাঝখানে একজন তরুণ পড়ে আছে, জিনসের প্যান্ট ও টিশার্ট গায়ে। দেহটা নড়ছে না; হয় মৃত কিংবা অচেতন। তার পরের দৃশ্যটা আমি দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দেখলাম, বিশাল আকৃতির একজন মানুষ আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে আসছে। তার হাতে একটা বোতল এবং সেই বোতলে কোনো এক ধরনের তরল। মানুষটা নিথর হয়ে পড়ে থাকা তরুণটির শরীরে বোতল থেকে তরল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা মানুষকে হত্যা করে প্রকাশ্যে

তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়িতে শত শত মানুষ, পথে শত শত পথচারী, দোকানপাটের মানুষ, ফেরিওয়ালা, স্কুলগামী শিশু—সবাই সেই দৃশ্য দেখছে।

আমি দৃশ্যটা কোনো দিন ভুলতে পারিনি, মনে হয় না কোনো দিন ভুলতে পারব। আমি সেই দৃশ্য কোনো দিন বুঝতেও পারিনি, মনে হয় না কোনো দিন বুঝতে পারব।

আমরা কেমন করে এ রকম হয়ে গেলাম? কেন আমরা প্রকাশ্যে একটা মানুষকে পিটিয়ে মেরে তার শরীরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারি?

আমার ধারণা, এতটুকু পড়ে অনেকেই ভুরু কুঁচকেছেন এবং সম্ভবত মাথা নেড়ে আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলছেন, এটা কখনোই হওয়া উচিত নয়। একটা দেশে এ রকম ব্যাপার কিছুতেই ঘটতে পারে না।

সেই আমরাই কিন্তু অবলীলায় ক্রসফায়ারকে সমর্থন করে যাচ্ছি। কিছুদিন আগে ক্রসফায়ার নিয়ে কোনো একটা খবরের কাগজে জরিপ নেওয়া হয়েছিল। সেখানে দেশের মানুষ রায় দিয়েছে যে তারা 'ক্রসফায়ার' বিষয়টা পছন্দ করে এবং তারা চায়, এটা যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক। পান্থপথে একজন 'সন্ত্রাসী'কে পিটিয়ে মেরে ফেলে তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া আর ক্রসফায়ারে একজনকে মেরে ফেলার মধ্যে আসলে সত্যিকার অর্থে কোনো পার্থক্য নেই। দুই জায়গাতেই দেশে যে আইন রয়েছে তা পুরোপুরি উপেক্ষা করে দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার একটা শর্টকাট পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে। পদ্ধতিটা অমানবিক, নৃশংস ও ভয়ংকর। সবচেয়ে বড় কথা, সেটা দেশের বিচারপ্রক্রিয়ার বাইরের একটা পদ্ধতি। কিন্তু এ দেশের মানুষ অবলীলায় সেটা সমর্থন করছে। কেন এটা হচ্ছে?

কারণটা খুবই সহজ। এ দেশের নানা ধরনের অপরাধী, সন্ত্রাসী আর গডফাদারকে আইনের আওতায় এনে বিচার করে বাকি জীবন জেলখানায় আটকে রাখার কথা ছিল—তাদের কারও কারও হয়তো ফাঁসিকাষ্ঠেও দাঁড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিচার বিভাগ মিলিয়ে সেই কাজটা করতে পারছে না। এই দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করা যায় না; যদি বা গ্রেপ্তার করা যায়, তাদের বিচার করা যায় না; যদি বা বিচার করা যায়, তাদের শাস্তি দেওয়া যায় না। কেন যায় না, তার কারণগুলো আমরা সবাই কম-বেশি জানি এবং সেই কারণগুলোর সংখ্যা কম নয়—অনেক।

কিন্তু এর অর্থ এই নয়, আমরা এক এক করে সেই কারণগুলো দূর করার চেষ্টা না করে সম্পূর্ণ অন্যায় একটা পথ বেছে নেব। অনেকের মনে হতে পারে, ক্রসফায়ারের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের একজন-একজন করে হত্যা করে আস্তে আস্তে এই দেশকে একটা নিরাপদ দেশে পরিণত করা হচ্ছে—যাঁরা এই প্রক্রিয়াটা দাঁড়া

করিয়েছেন, তাঁরা যে জানেন না এটা কত বড় একটা ভুল ধারণা, সেই বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করে। কেন এটা ভুল ধারণা, সেটা এক-এক করে বলা যাক :

১. খবরের কাগজে প্রতিদিনই ক্রসফায়ারের ঘটনার একটা বর্ণনা ছাপা হয় এবং সেই বর্ণনাগুলো হুবহু এক। পত্রপত্রিকায় যখন খবরটা ছাপা হয়, তখন তারা পাঠককে বুঝিয়ে দেয়, তারা সত্যিকারের কোনো ক্রসফায়ারের খবর ছাপছে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর 'তথাকথিত ক্রসফায়ারের' খবর ছাপাচ্ছে। দেশের প্রতিটা মানুষ জানে, ক্রসফায়ারের এই খবরগুলো মিথ্যা। প্রতিটা মানুষ জানে, আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে জাতিকে প্রতিদিন মিথ্যা কথা বলা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেশের সামনে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেটা কি আমরা মেনে নিতে পারি, নাকি যাঁরা সেখানে কাজ করেন তাঁদের মেনে নেওয়া উচিত?

২. আমাদের সরকার প্রায় প্রতিদিনই ঘোষণা দিচ্ছে, এ দেশে বিচারবহির্ভূত কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটানো হবে না। বিষয়টা প্রায় কৌতুকের পর্যায়ে চলে যায়, যখন আমরা খবরের কাগজের এক পাশে সরকারের এই উক্তি এবং অন্য পাশে একটা ক্রসফায়ারের খবর পড়ি। বিষয়টা দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—এক. সরকার আসলে বিষয়টা নিয়ে আন্তরিক নয় বা এই কথাগুলো দেশের মানুষের সঙ্গে একধরনের প্রতারণার মতো। দুই. সরকার আসলে যথেষ্ট আন্তরিক এবং সত্যি সত্যি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড থামাতে চাইছে, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একটা ফ্রাংকেনস্টাইনে পরিণত হয়েছে এবং তারা সরকারের কোনো আদেশ-নির্দেশ না মেনে নিজেরা নিজেদের মতো করে চলছে। এর মধ্যে কোনটা বেশি গ্রহণযোগ্য, আমার অন্তত জানা নেই।

৩. ক্রসফায়ার বা কোনো রকম বিচার না করে কোনো মানুষকে (বা অপরাধী) মেরে ফেলার এই প্রচলনটা দেশের মানুষের মধ্যে আইনকে কোনো রকম তোয়াক্কা না করতে শেখাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তো আর আইনের ঊর্ধ্বে নয়, তারা যদি তাদের বিবেচনায় কোনো মানুষকে হত্যা করে দেশের 'উপকার' করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, দেশের সাধারণ মানুষ কেন সেটা করতে পারবে না? তাহলে কি গ্রামের মানুষ মিলে সেই গ্রামের ছিঁচকে চোরকে মেরে ফেলবে? মহল্লার

মানুষ সেই মহল্লার ঘুষখোরকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে? দেশের মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া শিখে নেবে?

৪. ক্রসফায়ার ভয়ংকররকম অমানবিক। আমরা সভ্য জগতের মানুষ। একজন সন্ত্রাসী অবলীলায় সাধারণ একজন মানুষকে খুন-জখম করে ফেলে। এর অর্থ এই নয়, আমরাও অবলীলায় সেই সন্ত্রাসীকে খুন করে ফেলব। যে সমাজ বা রাষ্ট্র এই অমানবিক হত্যাকাণ্ড করে চলছে, আমরা যদি তার প্রতিবাদ না করি, থামানোর চেষ্টা না করি, তাহলে কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের রক্ত আমাদের হাতেও লেগে থাকবে। আমরা সভ্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চাই—বর্বর সমাজের অংশ হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না।

৫. এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের খবর তো পৃথিবীর কারও কাছে গোপন নেই। এর অর্থ, আমরা গোটা পৃথিবীর সামনে একটা বর্বর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি।

৬. ক্রসফায়ার একটা অমানবিক ব্যাপার। এই অমানবিক ব্যাপারটাও কিন্তু বৈষম্যহীন নয়। অসংখ্য জঙ্গি, সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে, তাদের কাউকেই কখনো ক্রসফায়ারে পড়তে হয়নি। কিন্তু উগ্রবামপন্থী সন্ত্রাসীরা রুটিনমাফিক ক্রসফায়ারে পড়ছে। সিদ্ধান্তগুলো কারা নিচ্ছে? ধর্মীয় জঙ্গিদের জন্য তাদের মমত্ববোধ বেশি কেন? এটা কি ভবিষ্যতের জন্য একটা সতর্কবাণী?

৭. ক্রসফায়ারের নামে এসব হত্যাকাণ্ড কীভাবে ঘটে, তার ডিটেলস আমরা এখনো জানতে পারিনি। আমার অনুমান, কর্তৃপক্ষের অনেক ওপর থেকে অনুমোদন দেওয়ার পর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো একজন সদস্যকে এই জল্লাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। যাঁদের এই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, তাঁরা বিষয়টি কীভাবে নিচ্ছেন? আমরা কি একজন সন্ত্রাসীকে হত্যা করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আরও একজন বড় সন্ত্রাসীর জন্ম দিচ্ছি, যার হাতে রাষ্ট্র অস্ত্র তুলে দিচ্ছে?

৮. এই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সবাই একধরনের ইনডেমনিটি ভোগ করছেন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য তাঁদের কারও বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

কিন্তু সব সময়ই কি এ রকম থাকবে? কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, কীভাবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, কারা এর দায়দায়িত্ব নিয়েছেন, কে হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন, কে সেই আদেশ পালন করেছেন—সেগুলো একদিন বের হয়ে আসবে না? তাঁদের একদিন বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না?

৯. তবে আমার নিজের কাছে মনে হয়, এই ক্রসফায়ার পদ্ধতির সবচেয়ে বেদনাদায়ক অংশটি হচ্ছে, সন্ত্রাসী মনে করে কোনো একজন নিরপরাধ মানুষকে মেরে ফেলা। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, এটা ঘটেছে এবং সেই নিরপরাধ মানুষটির পরিবারের সদস্যদের বুকের মধ্যে যে গভীর হাহাকারের জন্ম হয়েছে, সেটা কি এ দেশের কেউ শুনছে না?

আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে খুব সুন্দর একটা কথা আছে, সেটার হুবহু উদ্ধৃতি আমি দিতে পারছি না, কিন্তু তার অর্থটা এ রকম : একজন মানুষকে রক্ষা করলে পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করা, আবার একজন মানুষকে হত্যা করা হলে পুরো মানবজাতিকে হত্যা করা হয়?

কে আমাদের পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার ক্ষমতা দিয়েছে? কার এত বড় দুঃসাহস?

অপ্রকাশিত

গ্লানিমুক্তির ডিসেম্বর

ডিসেম্বর চমৎকার একটি মাস। এই মাসে শীতের একটা আমেজ পাওয়া যায়, বাগানে বাগানে রঙিন মৌসুমি ফুল ফুটতে শুরু করে, বাজারে শীতের সবজি উঠতে শুরু করে, বাচ্চাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষে তাদের আনন্দ শুরু হয়, বিদেশ থেকে আপনজনেরা দেশে বেড়াতে চলে আসে, নানা ধরনের দেশি-বিদেশি কনফারেন্স শুরু হয়। কিন্তু এর কোনোটাই ডিসেম্বর মাসকে আলাদা করে দেখার কারণ নয়। ডিসেম্বর চমৎকার একটি মাস। এর কারণ, এটি আমাদের বিজয়ের মাস। এই মাসে রাজাকাররা গর্তে ঢুকে থাকে। এই মাসে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের আলাদাভাবে স্মরণ করি। এই মাসে মন্ত্রী না হয়েও আমরা গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগিয়ে ফেলি। আমাদের মধ্যে যারা একাত্তরের ভেতর দিয়ে এসেছি, তারা বিজয় দিবসের কথা স্মরণ করে এখনো একধরনের শিহরণ অনুভব করি।

মনে হচ্ছে, এই ডিসেম্বর মাসে আরও একটা বিষয় যোগ হবে—এই মাসে বহু বছর পর আমরা পৃথিবীর একটা নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞের বিচার শেষ করে গ্লানিমুক্ত হতে পারব। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডটা অনেক দিক থেকেই ছিল অবিশ্বাস্য। এ দেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। খুব সংগত কারণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী অসংখ্যবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে চেয়েছে; কিন্তু সাহস পায়নি। অথচ বাংলাদেশের জন্মের সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা তাঁকে হত্যা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল—এটি এখনো বিশ্বাস করা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করার উদাহরণ খুব কম নেই। যুক্তরাষ্ট্রের লিংকন-কেনেডি থেকে শুরু করে মিসরের আনোয়ার সাদাত,

পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো বা ভারতের ইন্দিরা গান্ধী—ইতিহাসের পাতা উল্টালেই আমরা এ রকম অনেক উদাহরণ পেয়ে যাব। কিন্তু শুধু বঙ্গবন্ধু নন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবারের সবাইকে হত্যা করার মতো নৃশংস ঘটনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে? নববিবাহিত বধূ কিংবা ১০ বছরের শিশুসন্তান? এই হত্যাকাণ্ডের সময় ঠিক কী ঘটেছিল, বহুদিন সাধারণ মানুষ সেটা জানতে পারেনি। বিচারপ্রক্রিয়ার কারণে সেই হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি আবার নতুন করে প্রকাশ পেয়েছে। আমার ধারণা, যাঁরা সেই বর্ণনাগুলো পড়েছেন, তাঁদের অনেকেই 'মানুষ' প্রজাতির ওপর থেকেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন।

খুনিচক্র শুধু যে বঙ্গবন্ধু আর তাঁর পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিল তা নয়, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আত্মীয়তা থাকার কারণে শেখ মণি ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতের পরিবারের প্রায় সব সদস্যকে হত্যা করেছিল। সেনাবাহিনীর যে কর্মকর্তাকে সব মৃতদেহ সমাহিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তার লেখা তালিকাটি পড়লে এখনো শিউরে উঠতে হয়। সেই দীর্ঘ তালিকায় বঙ্গবন্ধু, শেখ নাসের, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের পরিবারের সবার নামের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে একাধিক অজ্ঞাতপরিচয় ১০-১২ বছরের বালক কিংবা '১০ বছর বয়সী একটি ফুটফুটে বালিকা'-এর কথা। আমার খুব জানার ইচ্ছে করে, তারা কারা।

১৫ আগস্টের হত্যার মধ্যে ছিল একধরনের পাশবিক নৃশংসতা। এর পরের হত্যাকাণ্ড, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ঠান্ডা মাথায় একটা সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। নভেম্বরের ৩ তারিখ জেলখানায় বেছে বেছে সেই নেতাদের হত্যা করা হলো, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধারণ করে বাংলাদেশকে সামনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। জেলখানায় বন্দীদের হত্যা করার মতো নৃশংস ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু সেটা করা হয়েছিল, কারণ, এই খুনিচক্র তো শুধু পাশবিক আনন্দের জন্য খুন করেনি, তারা খুন করেছিল বাংলাদেশকে তার আদর্শ থেকে চিরদিনের জন্য লক্ষ্যচ্যুত করতে।

বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সবাইকে হত্যা করার নৃশংস ঘটনার পর সবাই হয়তো ভেবেছিল বর্বরতার সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু এ দেশের মানুষ শিউরে উঠে আবিষ্কার করল, সেই বর্বরতা শেষ হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তার ৪১ দিন পর ২৬ সেপ্টেম্বর খোন্দকার মোশতাক আহমদ 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' নামে পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম একটা দলিল প্রকাশ করলেন, যে দলিলে পরিষ্কার করে লেখা হলো, যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূদের হত্যা করেছে, শিশু রাসেলকে হত্যা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এ দেশে কোনো মামলা করা যাবে না। পৃথিবীর নৃশংসতম খুনিরা শুধু খুনি নয়, তারা এই দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষ—এ দেশের কোনো আইন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। ব্যাপারটা এখানেই শেষ

হলো না, ১৯৭৯ সালে সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচন করে জিয়াউর রহমানের দল বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়, আর ১৯৭৯ সালের এপ্রিলের ৯ তারিখ কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ পঞ্চম সংশোধনী নামে আমাদের সংবিধানে স্থান করে নিল! এটি আমাদের সেই সংবিধান, যা এ দেশের মুক্তিযোদ্ধারা বুকের রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করে অর্জন করেছিলেন। যে বঙ্গবন্ধু এ দেশকে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ঘোষণা করা হলো, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের এ দেশের মাটিতে বিচার করা যাবে না! এর চেয়ে উৎকট নিষ্ঠুরতার উদাহরণ কি এই পৃথিবীতে আছে?

বঙ্গবন্ধুর খুনিরা তখন দেশ-বিদেশে সগৌরবে তাদের হত্যাকাণ্ডের কথা ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে। বহুদিন পর এ দেশের মানুষ টেলিভিশনে তা দেখেছে; যারা দেখেনি, তারা ইন্টারনেটের ইউটিউবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী (bangabandhu killer) লিখে খোঁজ করলেই সেটা পেয়ে যাবে। সেই হত্যাকাণ্ডে জিয়াউর রহমানের সম্পৃক্ততা কতটুকু ছিল, তাদের নিজের মুখে দেশের মানুষ, পৃথিবীর মানুষ শুনতে পারবে।

তারপর এক দিন নয়, দুই দিন নয়, এক বছর নয়, দুই বছর নয়, ২১ বছর কেটে গেছে। জিয়াউর রহমানের সরকার, এরশাদের সরকার এবং খালেদার সরকার সেই খুনিদের টানা ২১ বছর বুক আগলে রক্ষা করেছে, দেশ-বিদেশে কূটনীতিকের চাকরি দিয়েছে; তাদের পদোন্নতি হয়েছে, সগর্বে তারা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে সেই ইনডেমনিটি বিলটি আমাদের সংবিধান থেকে অপসারণ করে প্রথমবার খুনিদের আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার ব্যবস্থা করেছে। খুনিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই বিচারকাজ শেষ হতে সময় লেগেছে ১৩ বছর।

মামলা করা যায়নি ২১ বছর, মামলা করার পর বিচারকাজ শেষ হতে সময় লেগেছে ১৩ বছর। এর মধ্যে বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি, যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকে বিব্রত হয়েছেন এবং সেগুলো দেখে আমরা শুধু বিব্রত হইনি, ক্ষুব্ধ হয়েছি, ক্রুদ্ধ হয়েছি। তার পরও দেশের মানুষ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। একটা ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে ঝটপট বিচার করে খুনিদের ঝুলিয়ে প্রতিশোধের তীব্র আনন্দটুকু সহজেই পাওয়া যেত; কিন্তু সেটা করা হয়নি। এটা আমাদের দেশের বিশাল একটা অর্জন। আমরা এখন মাথা তুলে বলতে পারি, এ দেশের মাটিতে আমরা খুনিদের বিচার করে দেশকে, দেশের মানুষকে গ্লানিমুক্ত করেছি।

আত্মস্বীকৃত খুনিদের দম্ভোক্তিগুলো আমরা অসংখ্যবার শুনেছি, নতুন প্রজন্ম ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন আরও অনেক সহজে শুনতে পারে। বিচারকাজ চলার সময় আবিষ্কার করেছি, প্রাণ বাঁচানোর জন্য এখন তারা সব দায়দায়িত্ব অস্বীকার

করে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে, এটা দেখে আমরা না চাইলেও আমাদের ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। আমি চাই, যখন তাদের গলায় জল্লাদেরা ফাঁসির দড়িটা পরাবে, তখন অন্তত একবারও যেন তাদের সামনে শিশু রাসেল এবং ১০-১২ বছরের নাম না-জানা সেই বালক বা ফুটফুটে বালিকাদের চেহারাটা ভেসে ওঠে।

দুই.

আমি আশা করছি, বর্তমান সরকার আত্মতুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭৫ সালের সেই সময়টুকুর কথা একবার ভাববে। বঙ্গবন্ধুর খুনিরা সেই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর দুঃসাহস পেয়েছিল কারণ, তখন দেশটা ভালো চলছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, অর্থনীতি বলে কিছু নেই, খাবার নেই, দুর্ভিক্ষ, বাকশাল, রক্ষীবাহিনী—সব মিলিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ ছিল হতাশ ও ক্ষুব্ধ। এত দিন পর আমরা জানি, এর অনেকটুকু ছিল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফল; অনেকটুকুর ওপর কারও হাত ছিল না, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারকে স্বীকার করতেই হবে, একটা বড় অংশ ছিল তাদের ভুলভ্রান্তি এবং অন্যায়-অবিচার। বঙ্গবন্ধুর দলের মানুষের অপকর্মের দায়ভারই নিতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধু আর তাঁর পরিবারের মানুষকে। যদি সেই সময় আওয়ামী লীগের অনেক সমর্থক আর কর্মী দেশটাকে এ রকম নৈরাজ্যকর একটা জায়গায় ঠেলে না দিত, এই খুনিরা তাহলে এত বড় একটা ঘটনা ঘটানোর দুঃসাহস পেত না।

আওয়ামী লীগ আবার দেশ শাসনের দায়িত্বটুকু পেয়েছে, দেশের মানুষ অনেক বড় স্বপ্ন দেখে তাদের ক্ষমতায় এনেছে। প্রতিমুহূর্তে তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে, আমার দলের মানুষ কি এ দেশের সাধারণ মানুষের মন বিষিয়ে দিচ্ছে? দলের মানুষ ছোট একটা লাভ করার জন্য কি পুরো দেশকে বিশাল একটা বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে?

আমি পুরো দেশের খবর জানি না, খবরের কাগজে অত্যন্ত খণ্ডিত একটা ছবি দেখি, সেটা থেকে অনুমান করার চেষ্টা করি। সব সময় অনুমান সঠিক হয় না। কিছুদিন আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সংগঠন বাউল সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। কোনো একটা কারণে ছাত্রলীগের ছেলেরা সেখানে হামলা করে স্টেজ ভেঙেছে, চেয়ার-টেবিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলেছে, সাউন্ড সিস্টেম নষ্ট করে দিয়েছে। বাংলাদেশের সব খবরের কাগজে খবরটা ছবিসহ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। যে খবরটা ছাপা হয়নি সেটা হচ্ছে, তার পরও সবাই মিলে অত্যন্ত চমৎকারভাবে দুই দিনের সেই বাউল সম্মেলন অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর-বাইরের সবাই সেটা উপভোগ করেছে। কাজেই, খবরের কাগজ থেকে আমরা যে তথ্যগুলো পাই, সেগুলো খণ্ডিত, সেগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়।

কিন্তু যে বিষয়গুলো আমি নিজের চোখে দেখি, সেগুলো খণ্ডিত নয়, সেগুলো পূর্ণাঙ্গ। কাজেই, আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের চোখে দেখেছি, এখানে ছাত্রলীগের ছেলেরা নিজেদের ভেতর মারামারি করছে, একদল আরেক দলের ওপর হামলা করছে। সেই হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছে, ধর্মঘট ডেকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, নিজেরা নিজেদের কুপিয়ে আহত করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনেট ব্রাউজ করার সবচেয়ে সুন্দর ল্যাবরেটরিটি ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে। আমি অন্তত এই একটা ঘটনার কথা বলতে পারি, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সুন্দর ডিজিটাল পরিবেশটা তারা অবলীলায় ধ্বংস করে দিয়েছে। (আমার এত মন খারাপ হয়েছিল যে আমি সেটা কখনো দেখতে যাইনি। বিশ্ববিদ্যালয় নিজের খরচে সেটা আবার ঠিক করে দিয়েছে।) শুধু যে দল বেঁধে এ রকম হাঙ্গামা হচ্ছে তা নয়, নীতিহীন নেতা তৈরি হচ্ছে, তারা মাস্তানি করছে, ছাত্রীদের অসম্মান করছে।

আমি জানি, আওয়ামী লীগের বড় নেতারা এই পুরো ব্যাপারটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলবেন, সমগ্র দেশের বিশাল কর্মকাণ্ডের তুলনায় এটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিষয়! কিন্তু এই ছোট ছোট অসংখ্য ক্ষুদ্র বিষয় যখন একত্র হয়, তখন সেটা আর ক্ষুদ্র বিষয় থাকবে না। যখন দেশের মানুষ একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে, 'ধুর! এদের দিয়ে কিছু হবে না। সবই আসলে এক মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ!' তখন তাদের বুঝতে হবে, একটা খুব ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। আমরা নিজের চোখে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট দেখেছি। তাই আমরা কোনোভাবেই হতাশ ও ক্ষুব্ধ দেশবাসী দেখতে চাই না।

শুধু যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অসহিষ্ণু ছাত্রলীগ-যুবলীগের তাণ্ডব হচ্ছে তা নয়, আরও বড় বড় ব্যাপারও ঘটছে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অত্যন্ত দক্ষ ও কার্যকর ছিলেন। তিনি সৎ ও নীতিবান মানুষ ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। আমি যত দূর জানি, পদত্যাগপত্রে তিনি স্পষ্ট করে সেই কথা লিখে দিয়েছেন। শুধু যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম ঘটেছে তা নয়, পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই একই ঘটনা—ভাইস চ্যান্সেলরকে সরে যেতে হয়েছে। আমি দেশের অন্য অনেক কিছু না বুঝতে পারি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হয় আর কী না হয় সেই জিনিসটা বুঝতে পারি। তাই আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যে কাজগুলো ঘটছে, সেগুলো কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলো যে শুধু অনৈতিক তা নয়, এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ভয়ংকর ক্ষতিকর। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঠিক মানুষকে নিয়োগ না দিয়ে দলীয় অপদার্থ মানুষকে জোর করে ঢুকিয়ে দিলে সেই বিশ্ববিদ্যালয় আর কোনো দিন মাথা তুলে

দাঁড়াতে পারবে না। অন্যরা শুনছে কি না জানি না, আমরা কিন্তু এ দেশের অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যুঘণ্টা শুনতে শুরু করেছি।

আওয়ামী লীগ সাধারণ মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে, তাদের অনেক বড় কাজ করার সুযোগ আছে। কিন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ দলীয় কিছু বিষয়ে নাক গলিয়ে তারা যেন কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের মন বিষিয়ে না দেয়। এই অতি সাধারণ বিষয় বোঝার জন্য কি রকেটবিজ্ঞানী হতে হয়?

তিন.

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখনই বড় কিছু ঘটেছে, তখন ছাত্র-শিক্ষক সবাই আমাদের লাইব্রেরির সিঁড়িতে এসে জড়ো হয়েছি। একজন-দুজন কিছু বলে, অন্যরা শোনে। ১৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ছাত্র-শিক্ষকেরা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। ছাত্ররা কথা বলেছে, শিক্ষকেরা কথা বলেছেন। বক্তব্যের বিষয়বস্তু মোটামুটি এক—আমরা কলঙ্কমুক্ত হয়েছি, একই ধারাবাহিকতায় জেলহত্যা মামলার বিচার করে দ্বিতীয়বার কলঙ্কমুক্ত হব। আমাকে যখন কথা বলতে দিয়েছে, আমি তখন আরও একটা কথা যুক্ত করেছি; বলেছি, আজ যেমন এখানে এসেছি, ঠিক সে রকম কিছুদিনের ভেতর আবার এখানে এসে আমরা ঘোষণা করতে চাই, 'যুদ্ধাপরাধীর বিচার করে পুরো জাতি আজ কলঙ্কমুক্ত হলো।'

সরকার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারা যুদ্ধাপরাধীর বিচার করবে। আমরা সরকারের সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছি। আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি সেই প্রক্রিয়াটি শুরু হওয়ার জন্য। এটা ডিসেম্বর মাস, এটা বিজয়ের মাস। এই মাসে দেশের সবাই যেন নতুন করে ঘোষণা করে যে এ দেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীর বিচার আমরা করবই করব।

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করে আমরা প্রথমবার অনুভব করেছি গ্লানিমুক্তির অনুভূতি কী রকম। যুদ্ধাপরাধীর বিচার করে আমরা নতুন করে আবার সেই গ্লানি আর কলঙ্ক ধুয়ে-মুছে ফেলতে চাই।

নতুন প্রজন্মের চোখের দিকে তাকিয়ে তখন আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারব, বাঙালি বীরের জাতি—এ জাতির ইতিহাসে কোনো গ্লানি নেই, কোনো কলঙ্ক নেই।

প্রথম আলো : ১ ডিসেম্বর ২০০৯

স্বপ্নের দেশ

আমি খুব আশাবাদী মানুষ। আমার আশাবাদ কোন পর্যায়ের সেটা বোঝানোর জন্য আমি সব সময়ই একটা বাচ্চা ছেলের গল্প বলে থাকি। সেই বাচ্চাটাও খুব আশাবাদী ছিল এবং এ কারণে তার কখনোই মন খারাপ হতো না। সব সময়ই সে হাসিখুশি থাকত, সব সময়ই নতুন নতুন বিষয় নিয়ে স্বপ্ন দেখত। তার বাবা-মা সেটা নিয়ে একধরনের দুশ্চিন্তায় ভুগতেন। তাঁরা ভাবতেন, বাচ্চাটার জীবনে খানিকটা দুর্ভোগ আছে। সে যখন বড় হবে তখন সে আবিষ্কার করবে যে জীবনের সবকিছুই আনন্দময় নয়, সেখানে হতাশা আছে, ব্যর্থতা আছে; তখন তার নিশ্চয়ই খুব আশাভঙ্গ হবে। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, এখনই তাকে সেটা সম্পর্কে ধারণা দেবেন। তাই একদিন বাচ্চাটা যখন স্কুলে যায়, বাবা-মা তখন রাস্তা থেকে ঘোড়ার গোবর এনে তার ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য খুবই সহজ—বাচ্চাটা যখন ঘরে আসবে, সেখানে গোবর দেখে তার পিলে চমকে উঠবে। সেই গোবর পরিষ্কার করতে করতে তার জীবনটা বের হয়ে যাবে এবং সত্যিকার জীবন যে কত কঠিন হতে পারে সেটা সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। বাবা-মা বাচ্চাটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। সত্যি সত্যি ছোট বাচ্চাটা স্কুল থেকে ফিরে এল, নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং তার ঘরের মধ্যে ঘোড়ার গোবর দেখে সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। বলল, 'আমার ঘরে ঘোড়ার গোবর! তার মানে ঘোড়াটা নিশ্চয়ই আশপাশে আছে! কী মজা!'

আমিও ছোট বাচ্চার মতো জীবনের অনেক সময়ই আনন্দে চিৎকার করে ঘোড়ার খোঁজ করেছি এবং বলতে দ্বিধা নেই, অনেক সময়ই সত্যি সত্যি ঘোড়া

খুঁজে পেয়েছি। যখন পাইনি, তখনো খুব ক্ষতি হয়নি; খুঁজে পাব, সেই আনন্দেই সময়টা বেশ কেটে গেছে।

আমার ধারণা, শুধু আমি নই, আমার প্রজন্মের প্রায় সবাই এ রকম আশাবাদী মানুষ। তার একটা কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে ১৯৭১। আমরা এ সময়টার ভেতর দিয়ে এসেছি। যারা এ সময়টার ভেতর দিয়ে এসেছে, তারা অন্য রকম মানুষ হতে বাধ্য। তার কারণটা খুব সহজ।

আমরা ঊনসত্তরে একটা গণ-আন্দোলনকে দানা বাঁধতে দেখেছি, তখন দেশটা ছিল পাকিস্তান। আমরা যে অংশে থাকতাম, সেটার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে বৈষম্য থেকে উদ্ধার করার জন্য বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—ইতিহাসে সেই স্বপ্নটার নাম হচ্ছে 'ছয় দফা'। সেই ছয় দফার স্বপ্ন দেখে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁকে এমনভাবে জয়ী করেছিল যে তাঁর সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কখনো সেটা হতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। যখন তারা সেটা প্রকাশ করে ফেলল, তখন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এমন একটা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, যার কোনো তুলনা নেই। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে পড়েছিল। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ দেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; তারা এ দেশে যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল তার কোনো তুলনা নেই।

আমাদের প্রজন্ম সেই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ দেখেছে; কী অচিন্ত্যনীয় নিষ্ঠুরতায় মানুষকে হত্যা করা যায়, আমরা সেটা জানি। আমাদের প্রজন্মের একটি মানুষও নেই, ১৯৭১ সালে যার কোনো প্রিয়জন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে মারা যায়নি। তখন দেশের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি; সেই সাত কোটির এক কোটি মানুষই শরণার্থী হয়ে পাশের দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই এক কোটি মানুষকে যে কী অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে কিন্তু এ দেশের মানুষ ছিল সোনার মতো খাঁটি। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য এ দেশের সোনার ছেলেরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, আর তাঁদের বুক আগলে রক্ষা করেছে এ দেশের মানুষ। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে এ দেশের তরুণেরা অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। নয় মাসের মধ্যে দিশেহারা পাকিস্তান কী করবে বুঝতে পারছিল না, তাই ডিসেম্বরের চূড়ান্ত আঘাতের সময় তারা কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করেছিল।

আমাদের প্রজন্ম স্বাধিকারের জন্য আন্দোলন দেখেছে, নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখেছে, স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ দেখেছে, বীরত্ব দেখেছে এবং সবশেষে বিজয় অর্জন করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে দেখেছে। এক জীবনে যারা এত কিছু

দেখতে পারে, তাদের মতো সৌভাগ্যবান আর কে আছে? তাই আমাদের প্রজন্ম কখনো আশাহত হয় না, কখনো স্বপ্ন দেখতে ভুলে যায় না। আমাদের প্রজন্ম জানে, এই বাঙালির মতো অসাধারণ জাতি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা নেই। যখন প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তারা এ দেশের জন্য জীবনের সবচেয়ে বড় আত্মত্যাগটি করেছে। আমাদের প্রজন্ম তাই এত আশাবাদী; আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে এত নিশ্চিতভাবে স্বপ্ন দেখতে পারি।

আমাদের নতুন প্রজন্ম একাত্তরের সেই ভয়াবহ দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যায়নি। এ দেশের মানুষ তাদের ভেতর যে অসাধারণ একটা ভালোবাসা লুকিয়ে রাখতে পারে, তারা সেটা জানার সুযোগ পায়নি। দেশকে তীব্রভাবে ভালোবাসার মধ্যে যে একটা অভূতপূর্ব আনন্দ লুকিয়ে আছে, তারা সেটাও জানে না। সে জন্য আমি যখনই সুযোগ পাই, আমাদের এ নতুন প্রজন্মকে অনুরোধ করি তারা যেন বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাসটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। তারা যখন জানবে যে তারা কত বড় একটা জাতির অংশ, তখন শুধু যে তাদের বুক গর্বে ফুলে উঠবে তা নয়, দেশের জন্য গভীর মমতায় তাদের বুক ভরে উঠবে।

দুই.

কয়েক বছর আগে আমি একবার বাসে করে বগুড়া যাচ্ছি। আমি বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র। এ স্কুলের ১৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেখানে বিশাল আয়োজন করা হচ্ছে। আমি সেই আনন্দে অংশ নিতে রওনা দিয়েছি। মাঝপথে এক জায়গায় বাস থেমেছে। তখন একজন মা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার ছোট মেয়ে আপনাকে দেখিয়ে বলেছে, "ওই যে পাকা চুলের বুড়ো মানুষটি দেখেছ, সে হচ্ছে মুহম্মদ জাফর ইকবাল"!' আমি শিশু-কিশোরদের জন্য একটু লেখালেখি করি, সে জন্য অনেক সময় পথেঘাটে তারা আমাকে চিনে ফেলে সেটা সত্যি, কিন্তু এর আগে কেউ 'পাকা চুলের বুড়ো মানুষ' বলে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। পরিচয়টা নিয়ে আমি আহ্লাদিত না হতে পারি, কিন্তু কেমন করে অস্বীকার করি আমার বয়স অর্ধশত বছর পার হয়েছে এবং আমার চুলে আসলেই পাক ধরেছে?

যা-ই হোক, আমি সময়মতো বগুড়া জিলা স্কুলে পৌঁছেছি। সেখানে বিশাল আয়োজন। আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি, তখন চোখে পড়ল মাঠের এক কোনায় একটা ছোট প্যান্ডেলের মতো করা হয়েছে। সেখানে লেখা 'বগুড়া জিলা স্কুলের শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা'। আমি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকেই হঠাৎ একেবারে থমকে দাঁড়ালাম। ভেতরের দেয়ালে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে এবং আমার মনে হচ্ছে, তারা সবাই সেই দেয়ালের ছবি হয়ে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা সবাই আমার স্কুলজীবনের বন্ধু, তারা আমার সমবয়সী। আমি মাসুদকে দেখলাম, পাইকারকে দেখলাম, টিটুকে দেখলাম। আমরা একসঙ্গে

গল্প করেছি, খেলাধুলা করেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, স্কুলের বারান্দায় বসে কিংবা শুয়ে আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা করেছি। বড় হয়ে কী করব আমরা, তার কল্পনা করেছি। আমি এই পূর্ণ বয়সে সেই কল্পনায় যা চেয়েছিলাম, তার সবকিছু অর্জন করে ফেলেছি। আমার এখন বয়স হয়েছে, আমার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু আমার শৈশবের বন্ধুদের কারও বয়স বাড়েনি। কৈশোরে এসে তাদের বয়স থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তারা আর কোনো দিন সেই বয়স থেকে বড় হতে পারবে না। আমার মনে হলো, আমার বন্ধুরা সবাই তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হলো, তারা বুঝি আমাকে বলছে, 'যে দেশটার জন্য সেই কৈশোরে আমরা প্রাণ দিয়েছি, তোমরা কি সেই দেশটাকে আমাদের স্বপ্নের দেশ তৈরি করতে পেরেছ?'

আমি জানি, আমরা এখনো আমার সেই বন্ধুদের স্বপ্নের দেশ তৈরি করতে পারিনি। কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই পারব, কারণ তা না হলে আমাদের সেই রক্তের ঋণ শোধ হবে না।

আমি নতুন প্রজন্মকে শুধু সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

নবধারা : নারায়ণগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ বার্ষিকী ২০০৯

প্রথম বছর

আওয়ামী লীগ সরকারের (শুদ্ধ করে বলা উচিত মহাজোট সরকারের) প্রথম বছর শেষ হতে যাচ্ছে। বছরটা তারা কেমন চালিয়েছে, সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক আলোচনা-সমালোচনা হবে। কেউ কেউ তাদের গোল্ডেন ফাইভ দেবেন, কেউ কেউ পাস মার্কের বেশি নম্বর দিতে চাইবেন না, আবার নিশ্চয়ই কেউ কেউ ডাহা ফেল করেছে বলে ঘোষণা দেবেন। আমি নিজেও সরকারের প্রথম বছরটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু আমার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, আমি একচক্ষু হরিণের মতো—আমি নিজের পছন্দের বাইরের বিষয়গুলো দেখতে পাই না। শুধু তা-ই নয়, অনেক গুরুতর বিষয় চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু ছোট কোনো একটা বিষয় মাথার মধ্যে গেঁথে যায়, সেখানে কুটকুট করতে থাকে। এ রকম একটা মানুষের সরকারের প্রথম বছরের মূল্যায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা উচিত কি না, সেটা বুঝতে পারছি না। আবার মনে হচ্ছে, একচক্ষু হরিণেরা কেমন করে দেখে, সেটাও তো অনেকের জানার কৌতূহল থাকতে পারে। সে জন্যই এ ধৃষ্টতা।

আমার ধারণা, এ সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়নের একেবারে প্রথমেই চলে আসবে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের কাজটা শেষ করা। আমরা গ্লানিমুক্ত হয়েছি, শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর কাছে আমাদের গর্ব করে বলার সুযোগ হয়েছে যে একটা অত্যন্ত বড় অন্যায়কে হাজার প্রতিকূলতা ঠেলে আমরা বিচারের মুখোমুখি করতে পেরেছি। এখন ১৫ আগস্টের অন্যান্য হত্যাকাণ্ড আর জেলহত্যার বিচার শেষ করতে পারলেই এই কালো অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা যায়।

বিচারের কথা দিয়ে যেহেতু শুরু হয়েছে, তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথাটাও এ বেলা বলা যায়। কাজ চলছে—এ রকম আশ্বাসবাণী সব সময়ই শুনছি, কিন্তু যদি দেখতাম যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাহলে আরও বেশি জোর পেতাম। আশা করে আছি, যে ভবনে এই বিচারের কাজ শেষ হবে, সেটা এ দেশের একটা ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে পরিচিত হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেটা দেখতে আসবে, সেটা প্রায় একটা জাদুঘরে পরিণত হবে। তাই সে রকম মর্যাদাসম্পন্ন একটা ভবন বিচারের জন্য বেছে নিলে আরও ভালো হতো।

বিচারসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কথা বললে বিডিআর বিদ্রোহের কথাটাও চলে আসে। এ সরকার ক্ষমতা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ংকর ঘটনাটা পুরো দেশের নিরাপত্তার মূল ধরে টান দিয়েছিল। আমাদের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের যে নৃশংসতায় হত্যা করা হয়েছে, তার গ্লানি এ দেশকে সারা জীবন বহন করতে হবে। সেই ভয়ংকর ঘটনাটা সরকার যেভাবে সামাল দিয়েছিল, তার কোনো তুলনা নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে বেশির ভাগ কৃতিত্ব পেতে পারেন। সেনাকুঞ্জে তাঁর সঙ্গে ক্ষুব্ধ সেনা কর্মকর্তাদের বাক্যালাপের একটা 'গোপন' সিডি কোনো এক বিচিত্র উপায়ে প্রকাশ পেয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল; সেটা যারা শুনেছে, তারা আমাদের সেনা কর্মকর্তাদের বাচনভঙ্গি নিয়ে যতটুকু দুর্ভাবনা অনুভব করেছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাহস ও ধৈর্য দেখে ঠিক ততটুকু মুগ্ধ হয়েছে।

আমি যেহেতু একচক্ষু হরিণের মতো, তাই আমার চোখে শিক্ষার ব্যাপারগুলোই প্রথমে চোখে পড়ে। আমার মনে হয়, এ সরকারের অন্যতম একটা সাফল্য হচ্ছে স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাতে ঠিক সময়ে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া। এ জন্য আনুমানিক ১৯ কোটি বই ছাপতে হয়েছে (এবং প্রতিটি বই হাতে সেলাই করতে হয়েছে!)। আমার ধারণা, এটা গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে যাওয়ার মতো একটা ঘটনা। এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সাধারণ মানুষ এর গুরুত্বটুকু সঠিকভাবে ধরতে পেরেছে কি না, আমি জানি না। আমাদের দেশে প্রাইমারি স্কুল শেষ করার আগেই প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়ে ঝরে পড়ে। নবম-দশম শ্রেণীতে যেতে যেতে আরও অর্ধেক ঝরে পড়ে যাওয়ার বড় একটা কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য এবং বই কিনতে না পারা। সবার কাছে বই পৌঁছে দেওয়া হলে এই ঝরে পড়ার সংখ্যা কমে যেতে বাধ্য। শুধু তা-ই নয়, যেহেতু ছেলেমেয়েদের আর বইয়ের দোকান থেকে বই কিনতে হবে না, তাই তাদের কেউ জোর করে নোটবই-গাইডবই গছিয়ে দিতে পারবে না চিন্তা করেই আমার মুখে হাসি ফুটে উঠছে, সবগুলো দাঁত বের হয়ে আসছে আনন্দে।

শিক্ষা নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলার আছে, শুধু একটা বলেই আমি শেষ করব, সেটা হচ্ছে সমাপনী প্রাথমিক পরীক্ষা। যখন এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, অনেকেই সেটা নিয়ে দুর্ভাবনা করেছেন। আমাদের দেশে অতিদুশ্চিন্তিত অভিভাবক নামে একটা শ্রেণী তৈরি হয়েছে। তাঁরা নোটবই, গাইডবই বিক্রেতা বা কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ীদের মতো পদে পদে বাধা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের বাচ্চার ভালোমন্দটুকু দেখেন, সামগ্রিক বিষয়টা দেখেন না। তাঁরা পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছিলেন—তার পরও অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই পরীক্ষা শেষ হয়েছে, যেটা ছিল রীতিমতো একটা উৎসবের মতো। অতিদুশ্চিন্তিত অভিভাবকদের মতো ছোট বাচ্চাদের কোনো কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। তারা চমৎকারভাবে পরীক্ষা দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন আলাদাভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভাজন করে অল্প কিছু ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদাভাবে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনও নেই। দেশের মানুষ এখন প্রাইমারি স্কুলগুলোর অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছে। আশা করছি, স্থানীয় মানুষ তাদের স্কুলগুলোর অবস্থা ভালো করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সবার নিশ্চয়ই মনে আছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চালের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছিল এবং এই সরকার ক্ষমতায় এসে প্রায় ম্যাজিকের মতোই সেই দাম কমিয়ে নিয়ে এসেছিল। মোটা চালের দাম এখনো সহনীয় পর্যায়ে আছে। অন্য জিনিসপত্রের দাম বাড়ে-কমে। সরকার গঠন করার প্রথম দিকে যেভাবে অত্যন্ত কঠোর খবরদারি করে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, এখনো যদি সেভাবে করা হয়, মনে হয় চমৎকার একটা ব্যাপার হতো।

তবে কৃষিক্ষেত্রে মোটামুটি শিক্ষাক্ষেত্রের মতো একটা বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। সারের দাম কমিয়ে আনা হয়েছে, ডিজেলের দাম কমানো হয়েছে এবং সেচকাজে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। সার, বীজ, ডিজেলে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য প্রায় দুই কোটি কৃষকের ডেটাবেস তৈরি করা হয়েছে। দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুদ আছে। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে আমদানি কমিয়ে এ দেশ চাল রপ্তানি পর্যন্ত করতে পারবে। এককথায়, বিশাল একটা সাফল্য।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণা দেওয়ার পরও উল্লেখ করার মতো ডিজিটাল কাজ এখনো চোখে পড়েনি, তবে পাটের জিনোম বের করার একটা প্রজেক্ট শেষ পর্যন্ত হাতে নেওয়া হয়েছে। যাঁরা বিষয়টার গুরুত্ব বোঝেন, তাঁরা অনেক দিন থেকে এটার জন্য চেষ্টা করছিলেন, শেষ পর্যন্ত এর জন্য অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং কিছুদিনের মধ্যে এর কাজ শুরু হবে। আমার ধারণা, এটা হবে আমাদের দেশের প্রথম সত্যিকারের বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমরা এর শুরু ও শেষ দেখার জন্য

অপেক্ষা করছি। পাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগ্রহী অন্য বড় বড় দেশের সঙ্গে এটা হবে একটা প্রতিযোগিতার মতো। আমাদের দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের জন্য রইল আগাম শুভেচ্ছা।

দুই.

এ সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর যে ভুল করেনি তা নয়। আমার মতে, তাদের অত্যন্ত বড় ও অন্যায় কাজটা ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদকে পুলিশ দিয়ে আক্রমণ করিয়ে আহত করা। যে সরকার দেশের শিক্ষকদের এ রকম অমানুষিক নির্যাতন করতে পারে, তার ওপর বিশ্বাস রাখা কঠিন। আমি জানি না, সেই বর্বর ঘটনায় এ সরকার সাধারণ মানুষের যে সহানুভূতিটুকু হারিয়েছে, তারা কত দিনে সেটা আবার ফিরে পাবে।

প্রায় একই ধরনের, কিন্তু একটু অন্য রকম ঘটনা এখনো ঘটছে। সেটা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকারের দলীয় মানুষজনের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের ওপর একধরনের উৎপাত করে যাওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা ত্যক্তবিরক্ত হয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান। কুমিল্লা ও পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা ইতিমধ্যে ঘটেছে এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর পদত্যাগপত্রে সরাসরি সেটা উল্লেখ করে গেছেন। চট্টগ্রামের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে সেটা ঘটে চলছে, দলীয় কিছু মানুষ শিক্ষক ও প্রশাসকদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে তাঁদের উৎখাত করতে। সরকার যদি এ মুহূর্তে সেটা বন্ধ না করে, যাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে তাঁদের যথাযথ সম্মান দিয়ে ফিরিয়ে না আনে এবং যারা এই ঘটনাগুলো ঘটিয়ে যাচ্ছে তাদের শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখতে দেখতে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ যেন মনে না করে, জামায়াত-বিএনপির দলীয় মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করে আর আওয়ামী লীগের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করে। সব অপদার্থ দলীয় মানুষ দেখতে দেখতে একটা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলে।

এ সরকার একটা অত্যন্ত বড় সুযোগ হেলায় নষ্ট করেছে। জামায়াত-বিএনপি সরকারের আমলে ক্রসফায়ারের নামে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অমানবিক, অনৈতিক ও বেআইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল—আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে সেই নিষ্ঠুর, অমানবিক, অনৈতিক আর বেআইনি প্রক্রিয়ার দায়ভারটুকু নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। জামায়াত-বিএনপি সরকার থেকে তাদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। কারণ, এ সরকার সব সময়ই মুখে এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করে এসেছে। কাজেই সাধারণ মানুষের ধারণা হতে পারে, সরকার

ক্রসফায়ার বন্ধের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, মুখে মিছে কথা বলছে। অথবা সরকার আন্তরিক, কিন্তু র‍্যাবের ক্ষমতা সরকারের চেয়ে বেশি। সরকারের সব নির্দেশ অমান্য করে তারা নিজেরা অপরাধ দমনের নামে মানুষ খুন করে যাচ্ছে। এ দুটি সিদ্ধান্তের কোনোটাই এ সরকারের জন্য সম্মানজনক নয়। বর্তমান সরকার কেন জামায়াত-বিএনপি সরকারের এত বড় একটা অন্যায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিল, আমি বুঝতে পারি না। এই দায়ভার থেকে কীভাবে তারা মুক্ত হবে সেটাও আমি জানি না।

শুধু ক্রসফায়ার করে দেশকে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব, আমি সেটা বিশ্বাস করি না। ক্রসফায়ারে মারা পড়ছে এ রকম বড় বড় সন্ত্রাসীর পাশাপাশি ছোটখাটো সন্ত্রাসীও যে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলতে পারে, সেটাও মনে রাখতে হবে। 'ডিজিটাল টাইম'-এর কারণে অনেক মানুষকে এখন অন্ধকার থাকতে ঘর থেকে বের হতে হয়। কিছুদিন আগে এ রকম কিছু শিক্ষকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল—তাঁরা বলেছেন যে তাঁদের সবাই ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। বড় বড় মানুষ, যাঁরা শুধু যে গাড়িতে যান তা নয়, তাঁদের গাড়ির সামনে-পেছনে পুলিশ থাকে, তাই তাঁরা কখনো জানতেও পারেন না যে তাঁদের একটা ছেলেমানুষী সিদ্ধান্তের কারণে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের জীবনে কত রকম দুর্ভোগ নেমে আসে।

'ডিজিটাল টাইম' কথাটা যেহেতু উঠেই এসেছে, এ ব্যাপারে আরও দু-একটা কথা বলা দরকার। আমাদের শক্তি উপদেষ্টা কিছুদিন আগে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ঘড়ির কাঁটা আর পেছানো হবে না। তাঁর কথায় হতাশ হয়ে আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজকর্ম এক ঘণ্টা পরে শুরু করতে হবে। আমাদের সেই স্বাধীনতাটুকু আছে বলে করতে পেরেছি—যাঁদের নেই তাঁরা হতাশ হয়ে বিষয়টা মেনে নিতে চেষ্টা করেছেন। ১ জানুয়ারি থেকে আবার আগের সময়ে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে একটা অহেতুক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেছেন, সে জন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। গ্রীষ্মের শুরুতে ঘড়ির কাঁটা পরিবর্তনের যে ঘোষণা আছে, সেটা কার্যকর করার আগে সরকার যেন এ দেশের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একবার কথা বলে নেয়—সেটা হবে আমার ঐকান্তিক কামনা।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখেছি, মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে সেটা হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামে নামকরণ করা হবে। সিদ্ধান্তটা সুন্দর নয়, এর মধ্যে ধর্মকে ব্যবহার করার একটা কূটকৌশল আছে। তারা ধরেই নিয়েছে, ভবিষ্যতে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর তারা আবার আগের নামে ফিরে যেতে চেষ্টা করার সময় আবিষ্কার করবে, সেটা করতে হলে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর নাম পরিবর্তন করতে

হবে। সেটা করা হলে ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হবে এবং সেই ভয়ে ভবিষ্যতের জামায়াত-বিএনপি সরকার সেটা করার চেষ্টা করবে না। সোজা কথায়, বিমানবন্দরের নাম থেকে জেনারেল জিয়ার নাম অপসারণ করার জন্য সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগাতে হবে—এটা কোনোভাবেই একটা সম্মানজনক বা গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া হতে পারে না।

এর চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া হচ্ছে, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকেও অনেক বড় স্থাপনা তৈরি করে সেগুলোর নতুন নামকরণ করা। সেই ছোটবেলা আমরা শিখেছি, একটা লাইনকে ছোট করার দুটি উপায়, রবার দিয়ে ঘসে সেটার খানিকটা মুছে দেওয়া কিংবা তার পাশে বড় একটা লাইন টানা। মুছে দেওয়া হীন কাজ, পাশে বড় একটা লাইন টানা মহৎ কাজ। যখন মহৎ কাজ করার সুযোগ থাকে, তখন কেন একজন হীন কাজ করতে যাবে?

আওয়ামী লীগ সরকারের তেল-গ্যাসসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আমি একটু দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছি। কেউ যদি পরীক্ষা দেয় তাহলে সে পাস কিংবা ফেল করতে পারে; কিন্তু যদি পরীক্ষাই না দেয়, তখন পাস করেছে না ফেল করেছে সেই প্রশ্ন কি আমরা করতে পারি? দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তেল-গ্যাস রপ্তানি করা হবে না—সে কথা সবাই বলছেন; কিন্তু এ কথাটাই একটা আইনে পরিণত করার দাবি অনেক দিনের, সেটা কিন্তু হয়ে উঠছে না। শীতকাল এসেছে বলে আমরা বিদ্যুতের অভাবটা এত তীব্রভাবে বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমাদের দেশে কি সাধারণ মানুষ বা কৃষকদের স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়েছে?

তিন.

কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলো এখন এ দেশের মেগা-সমস্যা। তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের ট্রাফিক সমস্যা। এর দুটি অংশ আছে, একটি হচ্ছে দুর্ঘটনা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম। এমন কোনো দিন নেই, যেদিন ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনায় এ দেশে অনেক মানুষ মারা না যাচ্ছে। যাঁরা এ দেশের হাইওয়েতে যাতায়াত করেছেন, তাঁরা সবাই জানেন, এ দেশের ড্রাইভাররা যেভাবে গাড়ি চালায় তাতে আরও অনেক বেশি মানুষ মারা পড়ার কথা—সেটা যে ঘটছে না, সেটাই একটা রহস্য। গাড়ি চালানোর অত্যন্ত সহজ কিছু নিয়ম আছে, সেগুলো যদি মানা হতো তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা ৮০ ভাগ কমে যেত। কিন্তু কেউ সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সরকার যদি তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে ড্রাইভারদের ওপর চড়াও হতো, নিয়মনীতি মেনে গাড়ি চালাতে বাধ্য করত, তাহলে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারত, কয়েক লাখ মানুষকে পঙ্গু হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারত, তাদের পরিবারগুলো রক্ষা করতে পারত।

ঢাকার ট্রাফিক জ্যাম এখন মোটামুটি শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, জোড়াতালি দিয়ে এখন এটা থামানোর কোনো উপায় নেই। রীতিমতো গবেষণা করে এখন তার সমাধান বের করতে হবে। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে; আশা করছি, সঠিক উপায়টা খুঁজে বের করতে পারবে।

ট্রাফিক নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন আমার মনে হয়, আমরা ট্যাক্সিক্যাব-সিএনজিচালিত বেবিট্যাক্সি নিয়েও একটু কথা বলতে পারি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে কোনো না কোনো সময় ছিনতাইকারী বা মলম পার্টি বা অন্য ধরনের সন্ত্রাসের শিকার হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে এটা সরাসরি জড়িত, কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে অবশ্যই সরকারের নিরাপত্তা দিতে হবে, যার একটা হচ্ছে ট্যাক্সিক্যাব। একজন মানুষ যখন ট্যাক্সিক্যাবে উঠবে, তখন যদি তার নিরাপত্তা না থাকে তাহলে রাস্তায় সেই ট্যাক্সিক্যাবের থাকার অধিকার নেই। এ দেশের মানুষ সেই দাবির কথা বলতেও ভুলে গেছে।

এ দেশে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। অনেক সময় বিশাল বড় কাজও লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়, আবার অনেক সময় ছোট একটা কাজ নিয়েও দেশে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। দেশের ট্রাফিক জ্যাম আর রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা হচ্ছে সে রকম একটা ব্যাপার।

দেশের মানুষকে খুশি করার এ রকম একটা সহজ পথ থাকার পরও কেন সরকার তা করতে চেষ্টা করছে না, সেটাই হচ্ছে একটা রহস্য।

কালের কণ্ঠ : ১০ জানুয়ারি ২০১০